গণ্ডিছুট

ভ্রমণের ডানা মেলে

প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২৩, এপ্রিল ২০১৬

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : হরিসাধন দে অধিকারী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

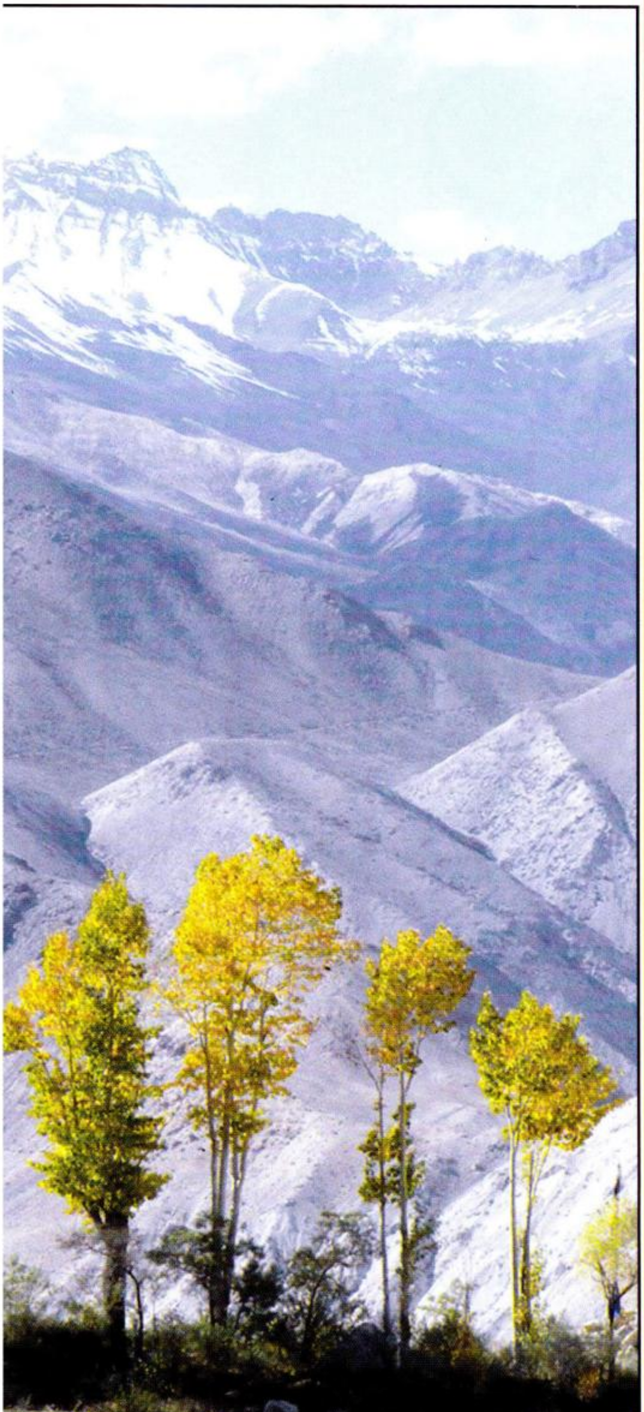
াকো, হিমাচল প্রদেশ ছবি- হরিসাধন দে অধিকারী

সূচির পাতা

আমাদের কথা ১

ভ্রমণে বিবর্তন ২ ভাস্কর রায়

এক মদির কবিতার দেশঃ
কাঞ্চনজঙ্ঘার গরিমাদীপ্ত চটকপুর ৪ শ্যামাপ্রসাদ সাঁই

একত্রে ধোত্রে ৭ প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য্য

স্মৃতির আলোয় কেদারনাথ ও
কিছু এলোমেলো প্রসঙ্গ ১০ দিলীপকুমার দত্ত

বসুধারার সুধা ১৪ মেঘনা রায়

অনবদ্য রম্ভা ১৭ রত্না ভট্টাচার্য

ভীমবেটকা ২০ নীলকণ্ঠ

অযোধ্যা পাহাড়ের প্রথম স্মৃতি ২২ জগৎপতি ঘোষ

ছবির পাতা ২৫

বোলান ২৯ সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

চা-বাগানের পথে পথে ৩৩ অরুণ সেনগুপ্ত

মর্ত্যের নন্দন কানন... বার্সে ৩৫ দেবনারায়ণ মাঝি

চলুন ত্রিপুরায় ৩৮ তপতী বর্মন

অম্বিকা কালনা ৪১ অসিত তা

বীরভূমের পঞ্চপীঠে ভ্রমণ ৪৪ শক্তিপদ ভট্টাচার্য

পাতার আড়াল ভেঙে ফুল চোখ মেলে ৪৯ গৌরী বর্মন

নেহাৎ দৈববশে ৫১ বিপ্লব বসু

গণ্ডীছুট

ভ্রমণের ডানা মেলে

বৈশাখ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২৩, এপ্রিল ২০১৬

সম্পাদনা- হরিসাধন দে অধিকারী

প্রচ্ছদ- বিপ্লব বসু ও পার্থ বসু

অলংকরণ ও অক্ষরবিন্যাস- পার্থ বসু

সহযোগী- ড. দিলীপকুমার দত্ত, ড. প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, অরিন্দম দত্ত, সনৎ গুপ্ত, ড. অরুণ সেনগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার- 'ভ্রমণ আড্ডা' ভদ্রেশ্বর, হুগলি

মুদ্রণ- নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬, গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

সম্পাদকীয় দপ্তর- বি-৬/৮৭, কল্যাণী, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫
ই-মেল- gandichhut@gmail.com
harisadhan.deadhikari@gmail.com
ফোন- ৯৪৩৩৯ ১৫০২৮

প্রকাশক- Kalyani People's Awarness Centre,
(Regd. under WB Societies Act 1961)
-এর পক্ষে Dr. P. C. Manna, Project Office:
B-12/54, Kalyani, Nadia, Pin-741235.
E-mail: kpac.in@gmail.com
Ph: (033) 2580 8009/98365 48233 (M)

বিনিময়- ২০ টাকা

'গণ্ডীছুট'-এ প্রকাশিত কোনও লেখা বা ছবি সম্পূর্ণ অথবা সম্পাদনা করে অন্যত্র প্রকাশের আগে সম্পাদকের অনুমতি একান্ত প্রয়োজন

আমাদের কথা

পৃথিবীর আবর্তনের কক্ষপথে আমাদের জীবন ছুটে চলে অবিরত— নিয়মতন্ত্রীতে বাঁধা হাজারো কাজের দায়বদ্ধতা নিয়ে মাঝেমধ্যেই ছুটির আবেদন জানায় মন, গতানুগতিকতার মাধ্যাকর্ষণ ছিঁড়ে চেনা গণ্ডীর বাইরে ভ্রমণের ডানামেলে হারিয়ে যেতে চায়— পাহাড়, জল, জঙ্গল থেকে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। তাই পকেটের জ্বালানী আর অবসরকে ঝোলায় ভরে বেড়িয়ে পড়তে চায় পায়ে পায়ে। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা—। কত দেখা— কত শোনা— কত শিল্প সংস্কৃতি— লোকগাথাকে দুর্মূল্য অনুভূতি ভরিয়ে তোলে ডায়েরির পাতা। লেখনীর গুণে আর লেন্সের কারিকুরিতে তারাই পায় অপূর্ব প্রকাশ।

ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, ভ্রমণপ্রিয় মানুষের চোখের ছায়া আর মনের সুবাস আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই অগণিত ভ্রমণপাগল মানুষের মধ্যে। এই সংকল্প নিয়েই দুই মলাটের মোড়কে জন্ম নিল 'গণ্ডীছুট' পত্রিকা। ভ্রমণের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিস্ময়, রোমাঞ্চ সবই থাকবে এর ডানার পালকে পালকে।

আশাকরি আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা গণ্ডীছুটের চলার পথকে করবে মসৃণ এবং হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে সফলতার লক্ষ্যে।

সম্পাদক

ভ্রমণে বিবর্তন

ভাস্কর রায়

বাঙালির বেড়ানোর কাব্যময়ী রূপটার নিরন্তর বদলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে পারি পুরনো কিছু স্মৃতি হাতড়ে বেড়ালেই।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা তীর্থ নির্ভর পর্যটনে মানুষের পদচিহ্ন পড়তো পুরী ধাম, বারাণসী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে। আবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে একটা সময়ে বাঙালির গন্তব্য ছিল দেওঘর-শিমুলতলা-রাজগির-ঘাটশিলা-কার্সিয়াং প্রভৃতি সুন্দর জলবায়ু সম্পন্ন স্থানগুলি। এসব জায়গায় শহুরে বাবুরা উঠতেন কোনও ভাড়া বাড়িতে কিংবা পরিচয় সূত্রে কারও আউট হাউসে।

এই দেব-দেউল-তীর্থযাত্রা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রিক ভ্রমণের পাশাপাশি বাঙালিকে হাতছানি দিতে থাকে সুরম্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকরসমৃদ্ধ স্থানগুলি।

এদিকে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে উত্তরণ ঘটতে থাকে দেশের। বিংশ শতাব্দীর পাঁচ-ছয়ের দশকে সম্প্রসারিত হতে থাকে বিদ্যুৎ-রেল-ব্যাঙ্ক-বীমা-ইস্পাত ক্ষেত্রগুলি। মানুষের বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণের ক্ষেত্র হয়ে পড়তে থাকে ভ্রমণ। সরকারিভাবে স্বীকৃতলব্ধ হয় এল টি সি-র সুবিধা (১৯৬৩-৬৪ সাল নাগাদ)। অথচ দেশে ততোটা প্রসার হয়নি হোটেল ব্যবসার। তখন ধর্মশালা কিংবা বাংলো ছিল বড়ো ভরসা। এই বাংলো শব্দটারই মোহময়ী আকর্ষণ ছিল তখন।

এদিকে সরকারি-আধা সরকারি-সওদাগরি সংস্থাগুলির চাকুরিজীবি মানুষজন এল টি সি-র সুযোগে দেশ ভ্রমণের স্বাদে আসক্ত হতে থাকেন। রেলের কামরা বুক করে উত্তর ভারত-দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। আর রেল কর্তৃপক্ষও উৎসাহিত করার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। যেহেতু হোটেলের বড়োই অসুবিধা তাই কামরায় রাত্রিবাস এবং প্ল্যাটফর্মে রান্নার আয়োজনেও কোনও অসুবিধাবোধ ছিল না। রেল কর্তৃপক্ষ যদি সি টি টি কোচ বরাদ্দ করতেন তাহলে ওই কামরাতেই সব ধরনের ব্যবস্থাই মিলতো। কামরাটির মধ্যিখানে থাকত রান্নাঘর। তার দুদিকে দুটি ডাইনিং কাম বেড (কাঠের টু টিয়ার বেঞ্চে শোয়ার ব্যবস্থা) আর একদম দুটি প্রান্তে দুটি পৃথক বাথরুম। এই কামরাগুলি হয় গার্ডের দিকে নয়তো ইঞ্জিন প্রান্তে জোড়া হত। যেন একান্নবর্তী পরিবারের উৎসব চলত। আর রেলকর্মীরা স্টেশনের আশপাশে ফাঁকা কোয়ার্টারে মাথা গোঁজার বন্দোবস্ত করতে পারলে যেন লটারির টিকিট পেতেন। বড়ো বড়ো ধনী ব্যবসায়ীরা তীর্থস্থানগুলিতে ধর্মশালার প্রসার ঘটিয়ে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে হলিডে হোম স্থাপনের জোয়ারে মধ্য ও নিম্নবিত্ত বাঙালিদের মধ্যেও ভ্রামণিক মানসিকতার বীজতলাগুলো উপযুক্ত রোপণক্ষেত্র পায়। দীঘা-দার্জিলিং-পুরী-হরিদ্বার-কেদার-বদ্রী এইসব ভ্রমণস্থান-গুলো ব্যতিরেকেও ক্রমশ বাঙালির পদচিহ্ন পড়তে থাকে নতুন নতুন নানান অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গন্তব্য-স্থলের দিকে। কারণ আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বাহিরমুখো হতে থাকেন অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ। আর এই হলিডে হোম স্থাপনের ইতিহাস নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি তৎকালীন বিহারের শিমুলতলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী সমবায় ১৯৬৩ সালে সূচনা করেন প্রথম হলিডে হোমটির। যশোরের মহারাজা নির্মলকান্তি রায়-এর বাড়িটি কিনেছিলেন অভিনেতা নরেশ মিত্র এবং সেই বাড়িটিই হাতবদল হয়ে হলিডে হোম রূপে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের দুই প্রবাদপ্রতিম সংগঠক আশীষ সেন ও নরেশ পালের সুদূরপ্রসারী ভাবনায় জীবনের মানবদল হয়েছিল মধ্য ও নিম্নবিত্ত কর্মচারীদের। ভারতবর্ষে কোনও ট্রেড ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে প্রথম হলিডে হোম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে। অবকাশ যাপনের জন্য হলুদপুকুরে আর বি আই এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের হলিডে হোমটি যেন নিজেরই বাড়ি। একে একে অন্যান্য ব্যাঙ্ক, সওদাগরী সংস্থা প্রভৃতির কর্মী সমবায় সংগঠনগুলির অন্যতম সুবিধাদান বা আকর্ষণের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে ওঠে হলিডে হোম। এখানে সবাই স্বচ্ছন্দ, সবাই সমান অংশীদার। একঘেয়েমি থেকে মুক্তি আর মানসিক স্বাস্থ্যবিকাশে প্রবল সহায়ক ভূমিকায়। এমনকি বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠান-জেলা পরিষদ-ব্যবসায়ী সমিতিগুলিও হলিডে হোম স্থাপনে

উদ্যোগ নেয়। প্রকৃত অর্থেই ভ্রমণের স্বাদে বৈচিত্র আনতে নৈনিতাল-মুসৌরি-সিমলা-শ্রীনগর-গ্যাংটক প্রভৃতি স্থানে হলিডে হোমের পরিধি বিস্তৃত হয়। বিশ-বাইশ দিনের মধুপুরে স্বাস্থ্যোদ্ধার কিংবা পুরীর তীর্থ ভ্রমণের বদলে সাত-আট দিনের নিজগৃহ হয়ে ওঠে এই হলিডে হোমগুলি।

তবে জগৎ পরিবর্তনশীল। তাই হলিডে হোমের ভূমিকা বর্তমানে বিগত যৌবনার মতো। এখন পেলিং-রাবাংলা-লাচুং-লাচেন- বার্মিওক-মন্দারমণি-সুনতালেখোলা ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে আড়াই থেকে পাঁচদিনের প্যাকেজ ট্যুর দেদার বিকোচ্ছে। দেশের বাইরে পাটায়া-সিঙ্গাপুরও এই প্যাকেজে। প্রতি স্কোয়ার ফুটের নিরিখে এখন ভ্রমণের মূল্য নিরূপিত হয়। তাই পুরী বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই হলিডে হোম থেকে কিচেন শব্দটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। পুরীতে কেবলমাত্র শোয়ার ঘরের মধ্যেই এক টুকরো মার্বেল স্ল্যাবে গ্যাস ওভেনের স্থান সংকুলান হচ্ছে।

উপসংহারে একটু প্রসঙ্গ ছুঁয়ে ভিন্নকথায় যাই, শুধুমাত্র একটি বন-বাংলো ও একটি হলিডে হোমকে সম্বল করে কিছু ভ্রমণমনস্ক মানুষ এক অসাধারণ অবর্ণনীয় সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ জয়ন্তীর খোঁজ জানতেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা সি ই এস সি-র কর্মী সমবায়ের পরিচালন সমিতির দূরদর্শিতায় আটের দশকের মধ্যভাগে 'অবকাশ' নামক অবসর আবাসটি ভূমিষ্ঠ হয়। আজ তা বক্সা রিজার্ভ টাইগার এরিয়ার কোর অঞ্চলে। এখন চলছে টানাপোড়েন কারণ বেশ কয়েকটি বেসরকারি বাংলো, হোম স্টে গজিয়ে ওঠায় টনক নড়েছে সরকারের। তবে বাংলার মধ্যে চমৎকার এমন নৈসর্গিক চিত্রপট খুব কম জায়গাতেই আছে, যেখান থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনের দূরত্ব মাত্র ৩২-৩৩ কিলোমিটার। তবে বক্সা ফোর্টের পথে একা না চলাই ভালো কারণ হঠাৎ বন্যজন্তুর ছায়া সরে যেতে পারে আর হলিডে হোম থেকে দুপা বাড়ানোর আগে কেয়ার টেকারের পরামর্শ নেওয়া জরুরী যেহেতু যূথবদ্ধ হাতির পালের আনাগোনার খবর ওর কাছেই থাকে। এইসব ভ্রমণের মৌতাত যারা নিয়েছেন তারা ভাগ্যবান বইকি!

ভাস্কর রায়
চাকুরিজীবী, নেশা– ভ্রমণ আর পত্র-পত্রিকায় লেখা।

SEBI REGISTERED

033-2580 8009
91434 77642 / 97489 68350
98365 48233 / 98365 17351

WORRIED about low Bank Interest?

Prudent investment in Stock Market
can give you higher return.

APPROACH

Business Associate of
FAIRWEALTH SECURITIES LTD.
B-12/54, Kalyani, Nadia

এক মদির কবিতার দেশ ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘার গরিমাদীপ্ত চটকপুর

শ্যামাপ্রসাদ সাঁই

একটা কবিতার জন্য

ক্লান্তির ভারে মনটা হাঁকপাঁক করছিল একটা কবিতার জন্য। তার জন্য চলছিল টানাপোড়েন, ছুটির জন্য হারিকিরি। সাত সপ্তাহের কাজ টেনে জড়ো করা হচ্ছিল এক সপ্তাহে সেরে ফেলার জন্য। যে জীবন মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো, তার প্রত্যেকটি সুতো ছিঁড়ে ফেলতে হচ্ছিল সাময়িক- ভাবে। অবিরত উৎকণ্ঠা টিকিট কনফার্ম হবে কিনা এই ভেবে। বই জমে উঠছিল টি-টেবল, সোফার উপর। বইয়ের নাম আর চ্যাপ্টারগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল কতরকম হিসেব নিকেশ একসাথে চুকিয়ে ফেলার প্রয়াস। ডেসিকেটর থেকে লেন্স, ক্যামেরা, মেমরি কার্ড, চার্জার– সব টেনে বের করা হচ্ছিল, ঝাড়পোঁছ চলছিল যত্নসহকারে। আর একবার লাগেজ ব্যাগটার শরীরে জৌলুষ এল। ভেতরটা ভরে গেল পোশাক আসাকে। ক্যামেরা ব্যাগটা ভারী হয়ে উঠল গর্ভবতীর মতো।

কোথায় পাব তারে

যেদিন অর্ধেক ঘুম সেরে রাত আড়াইটেয় উঠে, কোনওরকম পড়ি কি মরি করে তৈরি হয়ে টাইগার হিলে এক হই-হুল্লোড়ের রাজত্বে, মানুষের জঙ্গলে সপারিষদ তাকে দেখতে গিয়েছিলাম দার্জিলিং থেকে, দেখেও ছিলাম। এর লাথি ওর ঠেলা খেয়ে, ক্যামেরা ও চোখ সোজা রাখাই দায় হয়ে পড়েছিল। কানের কাছে বকর বকর 'কফি চাই', 'কফি চাই' শুনতে শুনতে আর সূর্য ওঠার সাথে সাথে সমবেত জনতার চিৎকারে চলচ্চিত্র জগতের কোনও নায়ক-নায়িকাকে দেখার মতো তাকে দেখেছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল এমনকি কোনও জায়গা নেই, যেখানে নিঃস্তব্ধতাকে সঙ্গী করে পাখির ডাককে সঙ্গে নিয়ে, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা পাইনের দলের সাথে, পাখির রঙিন ডানা থেকে রং চোখে মেখে আর হিমেল হাওয়ার পরশ নিয়ে অবাক হয়ে, স্থির হয়ে দেখব তাকে– ধ্যানগম্ভীর সেই স-পারিষদ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে! নেই কি তেমন কোনও জায়গা– সেই কবিতার দেশ। তখনই কে যেন চুপিসারে বলে গেল চট করে চলুন না চটকপুর।

না সেখানে আধুনিক রেস্টুরেন্ট দেওয়া যাবে না। না পারা যাবে দিতে কিছু স্টার-মার্কা হোটেল। কৃত্রিম সারে বেড়ে ওঠা সবজিও আপনাকে খাওয়াতে পারা যাবে না। সমস্ত চাষের জমিতে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং শাকেরা বেড়ে ওঠে জৈব সারে। তবে যেমনটি আপনি চাইছেন, এক নিষ্কলুষ কবিতার সন্ধান, তেমনটি দিতে পারা যেতে পারে। আসুন না ঘুরে যান। দেখুন কোনও কবিতার সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারেন কিনা দুটো দিন।

সে দেশের পথে

'বিনোদ ভাই এন জে পি আ গ্যায়া।' 'ঠিক হ্যায় কোই প্রবলেম নেহি। আ যাইয়ে।' তার আগেই অবশ্য বিনোদভাই এস এম এস করে জানিয়ে দিয়েছিল ড্রাইভারের ফোন নাম্বার। এন জে পি ঢোকার আগেই ড্রাইভারদার কণ্ঠ ফোনে বলে উঠল 'বহুত পহেলে মে আ চুকা হু।' ভীষণ চেনা জংশনের লম্বা ওভার ব্রিজটা পেরিয়ে সোজা চেরি রঙের টাটাসুমোর ডিকিতে মালপত্র গুছিয়ে একটু স্থিতিশীলতা। এবার এককাপ চা, সঙ্গে ব্রিটানিয়া মারি। কোনও ঝামেলাই পোহাতে হল না। এবার স্টেশন চত্বর ছেড়ে চেনা সে রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটল। যথারীতি চেনা ব্রিজটাও পেরোলাম এবং শিলিগুড়ি শহরে প্রবেশ। সবে মাত্র ঘুম ভাঙছে শহরের। কাজের তাগিদে উঠে পড়া মানুষগুলোর শিরা-ধমনীতে আরও একটু চঞ্চলতা ছড়িয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে। দু পেটি জল তুলে নিয়ে, মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে, চা-বাগানের সবুজকে চোখে নিয়ে এগিয়ে চললাম। সাদা চিকের দাগে চোখে চোখ রেখে কালো অজগরের উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল, যেখানে সোজা রাস্তা গিয়ে ধাক্কা মারছে কালচে সবুজ ঘুমিয়ে থাকা দৈত্যের উপর। না, ধাক্কা মারল না। অদ্ভুত এক দক্ষতায় গতির তীব্রতা কমিয়ে ঢুকে গেলাম লোমের মতো গাছ গাছালিতে ঠাসা দৈত্যের ভেতর। ওরে বাব্বা! কোথায় কবিতা! দু-চারটে বাঁক নিতেই দৃষ্টি আটকে গেল। পেয়ে গেছি–

কুয়াশার চাদর সরে কালচে সবুজ পাহাড়ে
কৃষ্ণচূড়া হয়ে ফুটে আছে সে আহারে!

ধ্যুৎ এটা আবার কবিতার লাইন হল! তার চেয়ে যা পারি তাই করি। একটা স্ন্যাপসট।

আর একটু গাড়ি যাওয়ার পর ড্রাইভারদা ডানদিকে দূরের এক পাহাড়কে দেখিয়ে বলল 'মেরা গাঁও চটকপুর উঁহাপে হ্যায়।' কেমন অদ্ভুত এক শোনালো ওর কথাটা। মনে হল কেমন এক স্বপ্নের দেশের দিকে যাত্রা শুরু করেছি।

কিন্তু মোমো ছাড়া এই কবিতার সন্ধান হয় নাকি? বলতেই গাড়ি দাঁড়াল এক রেস্টুরেন্টে– চিকেন মোমো আর কফি। বেশ জমল। মনটা খুশিতে ভরে যাচ্ছে। বাঁকে বাঁকে কৃষ্ণচূড়া আর সোদালের রং চোখে মেখে পৌঁছে গেলাম কার্শিয়ং। অদ্ভুত সবুজ চা বাগিচায় পথের চলাচল সত্যিই কবিতার সন্ধানে। এরপর কার্শিয়ংকে ও ট্রয়ট্রেনের লাইনকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি উপরে উঠতে লাগল। নীচের সবুজে কালচে রাস্তার আঁকাবাঁকা চলন ছবির মতো। এমনি করেই পৌঁছে গেলাম আরও একটা জনপদ সোনাদা।

গাড়ি থামিয়ে চটপট মুরগির মাংস, সবজি, আলু, পিঁয়াজ গাড়িতে চাপানো হতে লাগল। আরও দুজন গাড়িতে চড়ে বসল। তখন বুঝিনি এসবই আমাদের জন্য। গাড়ি ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চটপট ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঢুকে গেল এক গলি রাস্তায়। বাড়ি-ঘর জঙ্গলের বদ্ধ পরিবেশ ছাড়িয়ে অবশেষে আবার প্রকৃতির কোলে। রাস্তা খুবই খারাপ। তবুও প্রকৃতির মন ভোলানো রূপে সব ভুলে গেলাম।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

অবশেষে গাড়ি থামল এক গ্রামে ঢোকার মুখে। কিন্তু বিনোদভাইকে ফোনে পেলাম না। আমাদের সঙ্গে গাড়িতে আসা 'দাজু' বললেন 'বিনোদ ভাই বলেছে আমার বাড়িতেই আপনারা থাকবেন। সে জন্যই তো আমি বাজার করে আনলাম।' গাড়ি থেকে নেমে পড়া গেল এবং ক্যামেরার ব্যাগটা পিঠে নিয়ে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। অন্যান্য লাগেজগুলো ওনারাই বয়ে আনতে লাগলেন। কপির খেত, পিঁয়াজের-মুলোর খেত পেরিয়ে দাজুর বাড়ির সামনে থামলাম। যদিও জানা গেল রিসর্ট খালি আছে, কিন্তু দাজুর জন্য কেমন একটা মায়া হল। বাজার হাট করে এনেছেন, এরপর না থাকাটা অমানবিক। তাই স্থির হল ওই দিনটা দাজুর হোম স্টেতেই থাকব। পরদিন রিসর্টে চলে যাব।

ধাপে ধাপে দু-একটা সিঁড়ি বেয়ে মুলোর ক্ষেত পেরিয়ে নেমে এলাম বাড়ির উঠোনে। মহিলাদের মিষ্টি হাসিতেই আমাদের আপ্যায়ন হল। ঘর ছোটো হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গিজারও আছে। আর কী! এখন আমরা ২০-২১ পরিবারের একটা ছোট্ট গ্রাম চটকপুরে, দার্জিলিং মাত্র ২০ কিলো মিটার।

স্নান সারতেই খাবার রেডি– মানে দুপুরের খাবার। হোম স্টে সিস্টেম। তাই অর্ডার দেওয়ার দরকার নেই। ভাত-ডাল-সবজি ও ডিমের ঝোল ভালোই লাগল।

এবার গ্রাম ঘুরে দেখার পালা। বিনোদভাইও হাজির। যদিও আকাশ পরিষ্কার নয় তবুও এই মে মাসে ঠাণ্ডা ভালোই। তবে মনোরম। কারও বাড়ির পাশ দিয়ে, কারও বাড়ির উঠোন দিয়ে এগোলাম। সব বাড়িই সাজানো গোছানো। শুধু ফুলের টবে ভর্তি। সঙ্গে দুটো ক্যামেরাই নিতে ভুলিনি। একটা নেচার ও ল্যান্ডস্কেপের জন্য ওয়াইড লেন্স সমেত আর অন্যটায় পাখিদের জন্য ৫০০ mm ২০০ zoom লেন্স। প্রত্যেক বাড়ির মানুষের চোখে চোখ পড়লেই মিষ্টি অভ্যর্থনা। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ল্যাভেন্ডার রঙের গোলাপ ফুল গাছ সমেত টবে করে। ছবি তুলতে আবেদন। না তুলে পারা যায়!

গ্রামের বাড়িগুলোই ট্যুরিস্ট লজ দেখলাম। সুন্দর সাজানো গোছানো ব্যাপার। ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে ভিউপয়েন্ট। সরষের ক্ষেত। এক ঝাঁক পাখি আপনমনে খেলে বেড়াচ্ছে। ক্যামেরাবন্দী করলাম। কাউকে কাউকে ক্ষেতে কাজও করতে দেখলাম। বিনোদভাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। যেতে যেতে পৌঁছে গেলাম এক চাতালে। সামনে সারদিয়ে দাঁড়িয়ে পাইনের বেড়া। এই হল রিসর্ট এলাকা। চারটে ডাবল বেডরুম– পাশেই ছোট্ট প্রাইমারি স্কুল। দুটো সুন্দর বসার জায়গা। ছোটো একটি দোকান। টুকিটাকি কিছু পাওয়া যায়। দোকানের পাশেই হোম স্টে। মালকিন একজনই। সামনেই চেন দিয়ে বাঁধা কুকুর ডেনি। আপন মনে খেলে যাচ্ছে এক টুকরো বস্তা ছেঁড়াকে নিয়ে। মালকিনের হাতে বিস্কুট দেখে ডেনি দু-পা তুলে বিভিন্ন পোজে রেডি। ডেনির সঙ্গে ভাব করলাম। এমন নিশ্চুপ পরিবেশ। এমন নিরিবিলি বুনো গন্ধ– এমন কবিতার দেশ পাওয়া যায় না কি!

কফি হাতেই কালকের প্রোগ্রাম হল বিনোদ ভাইয়ের সাথে। আপন মনে ক্যামেরা হাতে ঘুরতে লাগলাম। কত রকমের পাখি। ঘন পাইন বন– চোখ জুড়ানো দেওদার জঙ্গল বন্দী করলাম। নীচে সবুজ উপত্যকা আর বাধাহীন উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অতি নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ। কিন্তু মেঘের লুকো- চুরিতে বেশি জমল না। কটেজের দিকে না গিয়ে সোনাদার দিকে একটু রাস্তা গিয়েই আগের পথ ধরে আবার দাজুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। একটু কফি, পকোড়া বেশ লাগল। ক্লান্তির জন্য একটু তাড়াতাড়ি রাতে শুতে গেলাম।

পরদিন সকাল সকাল কাঞ্চন জঙ্ঘাকে

দেখব বলে উঠে পড়লাম। নাহ্, আজও মেঘেরা সূর্য আর পাহাড়ের মধ্যে আড়ি করে রেখে দিয়েছে। ব্রেকফাস্ট সেরে চলে এলাম রিসর্টে। বেশ লাগল এই রিসর্ট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে দেখলাম গ্রামের মহিলারাই। সপ্তাহের সাত দিনেই তাদের কাজ ভাগ করা। দু-চার পয়সা এদের রোজগারও হয়। হোম স্টে থেকে একটু বড়ো ঘর ও খোলা জায়গায় এসে মেজাজটা যেন বদলে গেল। একটু যেন বেশি বেশি করেই কবিতার গন্ধ পেতে লাগলাম।

এমন বিশুদ্ধ নীরবতায় পায়চারি করতে করতে তাকে খুঁজতে লাগলাম। গাড়ি আসার রাস্তা ধরে পৌঁছে গেলাম সেই চাতালটায়—দৃষ্টি যেখানে বাধাহীন।

এমন করে পাওয়া

চাতালের সেই চত্বর ধরে পায়চারি করতে করতে তাকে খুঁজে পেলাম। কুয়াশা হয়ে সে আটকে আছে পাইনের ফাঁকে। অভিমানী প্রেয়সীর মতো মেঘ থেমে আছে দেওদার পাইনের ক্যানোপির চাদরের উপর। কখনও দূরে নদীর বাঁক হয়ে দেখা দেয়, কখনও ঢেকে যায় কুয়াশায়। ঘুমের ভান করা শিশুর মতো পাহাড়ি ফুল হয়ে মিটিমিটি চায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা হয়ে ভেসে থাকে আকাশের গায়। গাছে গাছে ডালে ডালে মিষ্টি সুরে প্যাখি হয়ে ডাকে আমায়— নিশি ডাকার মতো। মন বসে না সুসজ্জিত কটেজে। পরদিন সাত সকালেই বেড়িয়ে পড়তে হবে।

বিকেলে আবার চায়ের আসর। বিনোদভাই বলে চলে লক্ষ বছর ধরে সে টিকে আছে স্যালেমান্ডার হয়ে পোখরির জলে। নিয়ে যাবার লোভ দেখায়। সে বড়ো লাজুক। দিনের আলোয় তার দেখা পাওয়া ভার। সন্ধ্যা যখন নেমে আসবে, পোখরির জলে গাছের ছায়া যখন মিষ্টি হবে, হাওয়া আর বৃষ্টির মাতলামো থেমে যাবে— কুয়াশা ভারি হয়ে টুপ করে খসে পড়বে পোখরীর জলে— ঠিক তখন তারা বেরিয়ে আসবে, জলে খেলা করবে। চুপি সারে আমি তখন তোমায় নিয়ে যাব।

কটেজের চত্বরে দাঁড়িয়ে বিনোদভাই আরও বলে চলে— 'পাইন গাছের সার তাকে আড়াল করে রেখেছে। তুমি এই কটেজের চেয়ারে হেলান দিয়ে তার দেখা পাবে না। ভোরের আলো ফুটলে আমি নিয়ে যাব তোমায় ভিউ পয়েন্টে। ওই যে দু-পা দূরে। দেখবে সে কেমন ভেসে আছে নীল আকাশের গায়ে। তুমি যখন এই শান্ত পাখি ডাকা চটকপুর থেকে তাকে দেখবে, একটু নীচে তাকালেই একটা শহর ভেসে উঠবে তোমার চোখে। দার্জিলিং। তার থেকে যেন দু-হাত দূরে টাইগার হিলের মারকাটারি ভিড়ে তখন চলবে তার ফটোসেশন। কিন্তু এখানে দেখবে সে কোনও নায়িকা নয়, কোনও রাজনীতির ব্যক্তিত্ব নয়, সে কবিতা হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যায় চটকপুর লেকে গেলাম— বনের মধ্যে পাখি দেখতে দেখতে আর তাদের গান শুনতে শুনতে, অদ্ভুত এক গহীন অরণ্যের ঘ্রাণ নিতে নিতে। খুব ঘন কুয়াশার জন্য এক আধটা স্যালে মান্ডারের দেখা মিললেও তাড়াতাড়ি নেমে আসা অন্ধকার বাধ সাধলো। ফিরে এলাম। কফি আর পকোড়ার স্বাদ দিয়ে আশ মেটানো হল।

পরদিন কাক ভোরেই উঠে পড়লাম। রিসর্টের চত্বরেই ছোটো ছোটো রঙিন পাখিদের ঘোরাফেরা, কিন্তু মনের ছটফটানি টেনে নিয়ে চলল সেই ভিউ পয়েন্টে। অবশ্যই সাথে বিনোদ। গোটা গ্রামটা আমাদের নীচে ঘুমিয়ে আছে। শুধু মোরগের চিৎকারে আর একটা সকালের প্রতীক্ষা। সোজা উত্তরে দৃষ্টি আটকে যায় এক রূপোলি পিরামিডের অবয়বে। হ্যাঁ সবুজ-কালচে পাহাড়ের শেষে যেন আকাশে ভেসে আছে। ওই তো কাঞ্চনজঙ্ঘা। তার উপরে এক টুকরো মেঘ লালচে হতেই কে যেন ঘোষণা করে দিল প্রস্তুত। মন প্রাণ আর অবশ্যই ক্যামেরা লেন্স তাক করে প্রথম সোনালি আলোয় রাঙা হয়ে ওঠা সপারিষদ কাঞ্চনজঙ্ঘার মায়াবী রূপ ক্যামেরাবন্দী হল। মন আমার খুশিতে ভরে উঠল। এমন করে দেখতে পাওয়া! এমন রূপ মাধুরী, এমন নিষ্কলুষ নির্জনতায় চাক্ষুষ করা সত্যিই ভাগ্যের।

আপনার জন্য

এবার একটু অন্য তথ্য দিই। দার্জিলিং থেকে প্রায় ১ হাজার ফুট উঁচু মানে প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চতায় এই চটকপুর গ্রাম। এন জে পি থেকে দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার মতো। এটি সিনচল অভয়ারণ্যের একটি অংশে অবস্থিত। সোনাদা থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার। থাকার ব্যবস্থা, যদি রিসর্ট হয় তাহলে বুকিং করুন wind.025@gmail.com-এ। আর হোম স্টের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন বিনোদভাইয়ের সাথে। বিনোদ ভাইয়ের ফোন নাম্বার +৯১ ৯৬০৯৭৪০৪৮৯।

তবে হ্যাঁ, দেরি করবেন না। মনে বলছে তথাকথিত সভ্যতার গ্রাস থেকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে কি না এ গ্রামকে, তাতে ঘোর সন্দেহ আছে। তাই চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—এক কবিতার দেশে।

(ছবির জন্য দেখুন 'ছবির পাতা')

শ্যামাপ্রসাদ সাঁই

পেশা অধ্যাপনা, নেশা ভ্রমণ, বিশেষত পাহাড়ে ভ্রমণ। ছবি তোলা আর লেখালেখিতে প্রবল উৎসাহ।

একত্রে ধোত্রে

প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য্য

কতলোকে উত্তরাধিকারসূত্রে কত কী পায়– তা সে একেবারে শিলাইদহ-পতিসর না হোক, মুর্শিদাবাদের দিকে ধরা যাক একশো বিঘা ধানী জমি, বর্ধমানে সুপারিগাছ-ঘেরা চারটে টলটলে পুকুর যাকে সরোবর বলে। আর বাঁশঝাড়, সোনারপুর-বারুইপুরের দিকে একটা পেল্লায় বাগানবাড়ি উইক্‌এন্ডে উইথ্ বিয়ার মাছ-ধরতে যাওয়ার জন্য, শান্তিনিকেতনের পূর্ব বা রতনপল্লিতে মেরামতির প্রতীক্ষায় পাঁচিল-ঘেরা একটা চার-পাঁচ-কামরা হালকা-ব্যালকনি-সমন্বিত দোতলাবাড়ি, নিদেনপক্ষে নিউটাউনে বা গড়িয়ার দিকে একখানা তিন কামরার ফ্ল্যাট যেটা গত পনেরো বচ্ছরে টাকাটাকে মিনিমাম পনেরোগুণ করে দিয়েছে; কেউ উত্তরাধিকারে গোটা দেশ পায়, কেউ বা অ্যালুমিনিয়ামের সানকি। তা আমিও সৌভাগ্যে রাজাধিরাজ, জন্মসূত্রে আমিও পেয়েছি এক-রাত্তির দূরের হিমপাহাড়ে নিঝুম নিরালা একটা গোটা মখমলী বন-পরনে তার নীলসবুজ জামদানি, গলায় নাম-না-জানা জঙ্গলিফুলের মালা। তার মাথায় বিশ্বসুন্দরীর তাজের মতো পরানো আছে পৃথিবীর সুন্দরতম তুষারপর্বতের মুকুট। ভোরে কুসুমরঙা সূর্যের জলটিপ কপালে পরে শিশিরে স্নান করে উঠেও কেমন ঘুমজড়ানো চোখে সে আমার দিকে মদির তাকায় আর বলে, আজই চলে যাবে? থেকে যাও না আর দুটো দিন আমার কাছে?

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গাড়ির বন্দোবস্ত ছিল। পথ নেহাত কম নয়, প্রায় একশো-পাঁচ কিলোমিটারের সামান্য এদিক ওদিক হবে। দার্জিলিং-এর রাস্তা ধরে ঘুম অবধি গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে লেপচাজগত হয়ে সুখিয়াপোখরি। সুখিয়া বাজারে টি-ব্রেক নিয়ে সতেরো কিলোমিটার মানেভঞ্জন। সেইখানে সান্দাকফুর রাস্তা ভাগ হয়ে আবার বাঁ-পাশে খাড়াই পাহাড় চড়া শুরু করবে আর রিম্বিকের পথ বেঁকে যাবে ডানদিকে নির্জন অনিন্দ্যসুন্দর পালমাজুয়া ফরেস্টের মধ্যে। দেখতে দেখতে পাঁচহাজার ফিটের উপর উঠে আসা গেছে, রাস্তা চড়াই হবে উত্তরোত্তর আর তারপর এক জায়গায় হঠাৎ বন পাতলা হয়ে গিয়ে যে পাহাড় বেয়ে চলেছি তার গা দেখা যাবে, রোদ পাওয়া যাবে, আর তক্ষুণি বুঝবো আমি 'আমার' মখমলী বনের গ্রাম ধোত্রে এসে পৌঁছলাম আবার। পথ অবশ্য আয়েসী ধোত্রেকে ফেলে গড়িয়ে যাবে রিম্বিকের দিকে (আরও ২৩/২৪ কিমি)। শিলিগুড়ি থেকে আরেকটা রাস্তাও আছে, গাড়িধুরা থেকে শুকনা ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে রোহিণী হয়ে মিরিক। মিরিক লেকের পাড়ে কফি ও মোমো ভক্ষণ, তারপর যেন অফুরান থার্বো টি-এস্টেটের মধ্যে দিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে পশুপতিনগরের (নেপালের প্রবেশপথ) বিখ্যাত (বা, কুখ্যাত) বিদেশি জিনিসের বাজারকে বাঁ পাশে ফেলে ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায় সীমানা গ্রাম। সীমানায় মিনিট পনেরোর হল্ট হতেই পারে কারণ সে হল প্রথম পূর্ণদর্শনের ভিউপয়েন্ট, যদিও আমার মনে হয় এর মানে হয় না কোনও, পুরো পথটাই তো দর্শনীয়। এইবারের যাত্রায় দেখলাম এই সীমানা বাজার থেকে হুড়মুড়িয়ে নীচে নেমে গেছে সদ্য-তৈরী-হওয়া একটা রোগা পিচ-রাস্তা। সাহস করে ওতে গিয়ে দেখলাম সুখিয়ার ভিড় বাইপাস করে সরাসরি মানেভঞ্জন পৌঁছে গেছি মিনিট পনেরোর মধ্যে, এই শর্টকাটে সময় বাঁচলো তা প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তবে যেদিক দিয়েই যাওয়া যাক, দূরত্ব হরেদরে একই, সময়ও লাগবে ওই চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা। আমার প্রেস্ক্রিপশান সহজ– মিরিক হয়ে যাওয়া আর লেপচাজগত-ঘুম হয়ে নামা।

ধোত্রে গ্রাম পাহাড়ের পূর্বঢালে গড়িয়ে গেছে অল্প নিচ অবধি, ভোরে সূর্য উঠলেই তাই গ্রামের ঘরগুলোর টিনের চাল আলোয় ঝকমক করে ওঠে। বছর দশেক আগেও সান্দাকফু-ফালুট-ফেরতা ট্রেকারদল রিম্বিক থেকে গাড়ি চড়ে সদ্য সমাপ্ত ট্রেকিংস্টোরির বীররস নিয়ে জাবর কাটতে কাটতে কখন ধোত্রে পেরিয়ে যেতেন টেরও পেতেন না। এখন অবশ্য ধোত্রেতে রাতে-থাকবার কয়েকটি জায়গা তৈরি হয়েছে এবং গত চার বছরে দেখছি তার সংখ্যা বেশ হুড়মুড়িয়েই বাড়ছে। সেরাটা অবশ্য চিনজু শেরপার 'শেরপা লজ'। ওই চিনজু 'মাসীমা'-র বাড়িতে আমার ঘর আছে, আর সে কি যেমন তেমন ঘর? তার পুবের জানলায় সূর্য ওঠে আর পশ্চিমের

জানালায় সে মায়াবী আলোয় নিলাজ স্নান করে আমার আজন্মের প্রেমিকা রাজনন্দিনী কাঞ্চনজঙ্ঘা। নানা ক্যাল-কুলেশান করে কেউ কেউ যেমন শেয়ার বাছে, দার্জিলিং-এ হোটেল বাছে আলুপোস্ত পাওয়া যাবে কিনা দেখে নিয়ে, আমি অবশ্য এক্ষেত্রে তেমন কিছু গিন-চুনকে চিনজুর বাড়ি বাছিনি। আমি প্রথম যখন ধোত্রে যাই, সেখানে ওই একটিই রাতে-থাকবার জায়গা ছিল। গাঁয়ের শেষপ্রান্তে উচুঁ শিরার উপর বাড়ি থেকে সিঁড়ি দিয়ে দশ পা নেমে পিচ রাস্তা (রিস্কিক গেছে), সে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে একশো দিনের কাজে তৈরী চারফুটের পাথর-বাঁধানো পথ ধরে দশ মিনিটের চড়াই-এ ধোত্রে-ভিউপয়েন্ট। সেখানে আগে শুধু ছিল গায়ে-মন্ত্র-লেখা পাশাপাশি দুটি স্মৃতিবেদী আর একটি নড়বড়ে রেলিং গোছের ব্যাপার, এবারে দেখলাম তৈরী হচ্ছে ওয়াচটাওয়ার আর কংক্রিটের বড়ো ছাতা, বসবার জায়গা। সেখান থেকে কী দেখা যায়? ভাষায় বর্ণনা দিতে যেদিন পারব, মনে করব আমি আমার রাজনন্দিনীর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছি।

ওই ভিউপয়েন্ট থেকে সামনে একশো-আশি ডিগ্রি বিছিয়ে আয়েস করে শুয়ে আছেন ভগবান তথাগত, মুখমণ্ডল যাঁর কুম্ভকর্ণ পর্বত, উদর হল কাঞ্চন জঙ্ঘার মূল শৃঙ্গ (সাউথ পিক, তিনটে মোট, আমরা এত দূর থেকে আর এই দিক থেকে কেবল একটিই দেখতে পাই, এমন জায়গাও আছে যেখান থেকে নজর করলে দু' নম্বর শৃঙ্গটিও দেখা যায়), আর পদযুগল মাউন্ট পান্ডিম। 'স্লিপিং বুদ্ধা'-কে নিশ্চিন্তে শায়িত রেখে উল্টোদিকে মুখ ঘোরান, সূর্য আড়াল করতে চোখের উপর হাতের কার্নিস তৈরী করুন, আর দেখুন মুঠো-ভর্তি ধোত্রে কেমন টুক করে ফুরিয়ে গেল আমার সেই মখমলী বনে। ভিউ-পয়েন্টের উচ্চতা থেকে পাখির চোখে দেখে নিয়েছেন ধোত্রেকে, তাই আপনি এখন জানেন চিনজুর বাড়ির পাশ দিয়েই পায়েচলা পথ হারিয়ে গেছে গভীর সে মখমলী বনে। এইবার তবে বুদ্ধকে ঘুমন্ত রেখে ভিউপয়েন্ট থেকে নেমে এসে ঠিক উল্টোদিকে আবার চিনজুর বাড়ির পাশ দিয়ে ঢুকে পড়া যাক মখমলী বনে। একটু এগোলেই ধোত্রের প্রাইমারি স্কুল, সবুজ টিনের চাল, হলদেটে কাঠের ঘর, খাদের দিকে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা খেলার মাঠ, খুদে গোলপোস্ট। মাঠভর্তি ধুলো, পড়ুয়ারা বেশ দাপিয়ে খেলে বোঝা যায়, তাই ঘাস নেই মাঠে। মাঠ পেরিয়ে এগোই, পাথরে বাঁধানো হাঁটাপথ ওই স্কুল পেরোলেই ধীরে ধীরে পাহাড় চড়া শুরু করে। একটা চোর্তেন, পাহাড়ি নিয়ম মেনে তাকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলি আর আমার দু'পাশে ঘন হয়ে আসে মখমলী সিঙ্গালিলা ফরেস্ট। এই পথ গিয়েছে টংলু, মাত্র সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার ধোত্রে থেকে, দেদার আরামদায়ক গড়ানে পথ, শেষ এক কিলোমিটার কেবল সামান্য কষ্টকর চড়াই। টংলু থেকে চেনা রাস্তায় তুমলিং-গৈরিবাস-কালিপোখরি- বিখে-ভঞ্জন হয়ে সান্দাকফু।

কিন্তু এ যাত্রায় কেবল ধোত্রেরই গল্প হোক। পরিচিত সান্দাকফু-ফালুট ট্রেইলে এই ধোত্রে থেকে টংলু পথটি তুলনায় নতুন (নতুনই বা বলি কী করে, এ পথেও সিরিয়াস পাহাড়প্রেমী হাঁটছেন আজ প্রায় বিশ বছর হল), আর সহজ। সৌন্দর্যের তুলনাটা কুরুচিকর, তাই ওতে যাচ্ছি না। তবে এটুকু বলাই যায়, মার্চের শেষ বা এপ্রিলে এ পথে অন্তত দশ-পনেরো রকম রোডোডেনড্রন (সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে মোট ২০/২২ রকম রোডোডেনড্রন পাওয়া যায়) ও অন্যান্য নাম-না-জানা ফুলের মেহফিলে উপস্থিত হলে মুখর কবি কোন রূপবৈভবের সম্মোহনে নীরব হতে চাইবেন তা উপলব্ধি করতে আমার অন্তত অসুবিধে হয়নি। গাছ– এরা কী শুধুই গাছ? পাহাড়ি বাঁশ, ম্যাগনোলিয়া, ওক, সিলভার ফার, হেমলক, জুনিপার, ভূর্জপত্র– এ কোন অপার্থিব রেশমী সাজে সেজে রিনরিনে হাওয়ার বাঁশি বাজায় সারাদিন? মখমলে মোড়া এ রূপসীর বসনপ্রান্তে বাহারি কুচির মতো থরে থরে ফুটে থাকে জেরেনিয়াম, প্রিমুলা। সাদা আর পিচরঙা ম্যাগনোলিয়া ফুলভারে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়। একমাত্র ওখানে গেলেই আমার তীব্র আফশোস হতে থাকে, অর্থশাস্ত্রে ফেঁসে গিয়ে আহা কেন যে বটানি বা জুলজি পড়লাম না! এবারের সঙ্গী প্রাণীবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ও অধ্যাপক দেবাশিস গাছ-ফুল-পাখী কয়েকটা চেনাল। হিমালয়ান কোবরা লিলি আমি আগেই চিনতাম, ও ফুলে বিষ আছে (Arisaema), টংলু ছাড়িয়ে আরও উপরে সান্দাকফুর (পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্থান, ৩,৬৩০ মিটার) দুই কিলোমিটার আগে বিখেভঞ্জনের নামেই 'বিখে' এরই জন্য (বিখে-বিষাক্ত, ভঞ্জন-উপত্যকা)। সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের শিরোপা লাভ করেছে ১৯৯২ সালে এবং এ হল বিলীয়মান রেডপান্ডার আঁতুড়ঘর। ধোত্রে থেকে টংলুর পথ প্রায় পুরোটা ঘন জঙ্গল, পোর্টার ছোকরাগুলো ভারি ফক্কর, নরমসরম নভিস ট্রেকার দেখলেই ভয় দেখায়, সাব ইধার রুকিয়েগা মত, জঙ্গলমে লেপার্ড হ্যায়। –'হ্যায়' তো মালুম হ্যায় বচ্চে, লেকিন তাদের এক-আধ ঝলক দেখা দিতে এত লজ্জা পেলে চলে কী করে? ক্লাউডেড লেপার্ড

না হোক নিদেন পক্ষে লেপার্ড ক্যাট একখানা পথের বাঁকে যদি দর্শন দেয় সেই আশা বুকে চেপে ক্রমাগত উঠতে থাকি টংলুর দিকে। দেবাশিস কানে কানে ফিসফিস করে বলে যায়, দাদা এ জঙ্গলে ছোটো ভালুক (ব্ল্যাক বিয়ার), প্যানথার, কাকর হরিণ, প্যাঙ্গোলিনও আছে।

বলতে বলতে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ি, ছায়াময় হিমেল পথের পরে আহা রোদ্দুর তুমি রোদ্দুর —গা এলিয়ে দিই ঘাসের নরম রেশমি কার্পেটে (কোনও মরমানুষের সাধ্য কী অমন কার্পেট বোনে), হাত দুটো ভাঁজ করে রাখি মাথার নীচে, কারণ আমার এই স্বর্গীয় বেডরুমের সামনেই সুনীল আকাশজুড়ে ফ্রেমহীন টাঙানো আছে আমার রাজনন্দিনী কাঞ্চনজঙ্ঘার হীরে-ঝকমক ছবি। আমি মনে মনে কথা কইতে শুরু করি ওর সাথে, —কেন বারবার তোমার কাছে ফিরে ফিরে আসি বোঝো না, আর ''কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি''... আচ্ছা বরং থাক, এ জীবনে থাক না, —''কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়, কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়''... এমন সময়— 'দাদা দাদা, চটপট ওঠো ক্যামেরা নাও, গোল্ডেন ঈগল-' গাঢ় নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে রাজার মতো পাখা মেলে দুই সাথী মাথার উপরে চক্কর দিচ্ছে খুব বেশি হলে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে, উজ্জ্বল বাদামী ডানার প্রান্তে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠছে — হ্যাঁ সোনার ঈগলই বটে। এছাড়াও আমার এ রেশমী দরবারে রোজ ব্লাড ফেজ্যান্ট আর ট্র্যাঙ্গোপ্যানের নাচিয়ে দল নেচে যায়, গান গেয়ে যায় গোল্ডেন বুশ রবিন আর ব্যাবলারের ঝাঁক, নাচগানে তাল দেয় হিমালয়ান উডপেকার আর সিংদরোজায় ঘাড় বেঁকিয়ে পাহারা দেয় আমুর বাজপাখী। কমবেশি আড়াই শো রকমের পাখি দেখতে পাওয়া যায় এ চত্বরে, তাদের রূপবৈচিত্র্য বর্ণনা করবার মতো বিদ্যে আর ভাষা কোনওটাই আমার আয়ত্তে নেই, তবে তাতে অপার মুগ্ধতায় স্তব্ধ হওয়া ঠেকাচ্ছে কে?

তা ওই যে শুরুতেই বলেছি, এ মখমলী বন আমার জন্মসূত্রে পাওয়া, সে কথাটা আরেকটু ভেঙে বলে লজ্জাহীন এই প্রেমকাহিনি শেষ করি। ভেঙে বলাটা জরুরী। এই এলাকায় অনেক লোক আসছেন ইদানিং, গ্রামের লোকে হোম-স্টে না কি যেন বলে, আসলে স্রেফ হোটেল, তাও খুলছে একটার পর একটা, গাঁয়ে ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে (আগেরবার ২০১২-র ডিসেম্বরে ছিল না)। ধোত্রে থেকে টংলুর মায়াবী পথে টংলু টপের পাঁচ-সাতশো ফুট নীচে আছে ওই সাড়ে পাঁচ-ছয় হাজার ফিট উঁচুতে অবাক-করা অতি প্রশস্ত এক বুগিয়াল, তাতে পা মেলে বসেছি, সঙ্গে আনা কমলালেবুর খোসা ছাড়াচ্ছি। আকাশে খুব নীচে তখনও উড়ছে সেই গোল্ডেন ঈগল দম্পতি (ওরা নির্ঘাৎ তাই!)। এমন সময় দেখি —'ওরে বাবা দেখ চেয়ে কত সেনা চলেছে সমরে' —সমস্ত অত্যাধুনিক ট্রেকিং গ্যাজেটে সজ্জিত প্রায় চল্লিশ জনের একটি দল ধোত্রের দিকের জঙ্গল ফুঁড়ে উদয় হল। মুহূর্তে যে কোনও মেট্রোপলিটানের বড় শপিং মলের কলকাকলিতে ভরে উঠল সেই অনাঘ্রাত প্রাঙ্গণের অনাবিল বাতাস। কিছুক্ষণ হুল্লোড়ময় বিশ্রাম সেরে তারা আবার এগোল টংলুর শেষ চড়াই ধরে টংলুর দিকে। আমি ও আমার সঙ্গী চারজন বিষণ্ণ হাতে কুড়িয়ে আনলাম ছেঁড়া পটেটো চিপসের প্যাকেট, ক্যাডবেরির র‍্যাপার। পকেটে ভরে নিচে নিয়ে যাব এই সমতলিক পাপ। পাপ লুকোতে পারলাম, তবে দুশ্চিন্তা নয়। মনে হল আমি খানিক আগে জন্মাবার উত্তরাধিকারে এই রেশমী বন পেয়েছি বটে, পুত্রকে হাতে ধরে এখানে এনে দেখিয়েছি তার বংশানুক্রমে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যরাজি; কিন্তু আমার ঊনতিরিশ বছর পরে জন্মানো আমার সন্তানের কপালে বোধহয় সে সৌভাগ্য আর নেই। সে যদি কোনওদিন তার সন্তানকে ধোত্রে নিয়ে এসে তার পিতার ফেলে-যাওয়া পদচিহ্ন খুঁজতে যায়, হয়তো যারপরনাই হতাশ হবে। ধোত্রেতে তখন হয়তো পাঁচতলা হাটেল, এসি ব্যাঙ্কোয়েট হল, বাথরুমে রানিং হট ওয়াটার, খাবার টেবিলে কন্টিনেন্টাল ডিশ —শুধু ময়ূরকণ্ঠী রঙের বুক, ছোট্ট সেই থ্রাশ পাখিটি তার সমস্ত পরিবারপরিজন নিয়ে চিরতরে মুছে যাবে এই মখমলী বন থেকে, যেমন প্রায় মুছেই গেছে লাজুক রেড পান্ডার দল। পাকা রাস্তা রিম্বিক ছাড়িয়ে রাজাপীর, শেপি গ্রাম টপকে প্রায় শ্রীখোলা অবধি চলে গিয়েছে, দু-ধারে পোঁতা হচ্ছে ইলেকট্রিকের খুঁটি। পাহাড়ের গায়ে গাছের পোশাক ফেলে দিয়ে পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কংক্রিটের জামা। কবিতা তো হিয়েরোগ্লিফিক্স, বটানি জুলজির রোমান্টিকতাও মুছে গেছে, আজ ভবিতব্য নির্ধারণ করে আমার অর্থনীতি। পর্যটক বাড়বে, বাড়বে আয়। শ্রীখোলা-রাম্মামখোলা নিরুপায় চেয়ে চেয়ে দেখবে কেবল।

(ছবি– 'ছবির পাতা'য়)

ড. প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য

পেশা অধ্যাপনা। নেশা ভ্রমণ। পাহাড়ে ট্রেকিংয়ে প্রবল উৎসাহী। ভ্রমণকথা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখাও আরেক নেশা।।

স্মৃতির আলোয় কেদারনাথ ও কিছু এলোমেলো প্রসঙ্গ

দিলীপকুমার দত্ত

"হিমালয়ের ডাক দুঃখ দেয় অনেক সময়ে, কিন্তু দুঃখের মধ্যে প্রাণ-পার্বণের উদ্বোধনও ঘটায়।"
—প্রবোধকুমার স্যান্নাল

স্বর্ণযুগের গান শুনতে বসে মধুক্ষরা কণ্ঠের যাদু আর সুরের মায়াজালে সবকিছু ভুলে শুধু কানদুটো খাড়া করে যখন দীর্ঘবিলম্বিত টানে শুনি– "স্মৃতি তুমি বেদনা...", আবেগে তখন চোখ বুজে বিভোর হয়ে উঠি না, এমন কাউকে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। কিন্তু রসদর্শনের ছাত্র-হিসাবে বুঝি, –এই অতি-নির্জলা মিথ্যাবচনটি প্রচারের জন্য গীতিকার ও গায়ক দুই মিত্রই (পবিত্র ও শ্যামল) যেমন ঘোরতর অ-মিত্রের কাজ করেছেন, তেমনই সুরের মায়ায় ভুলিয়ে চক্রবর্তী-সুরকার-সুধীরলালও মোটেও সুধীর-বোধবুদ্ধির পরিচয় রাখেননি। কেননা যে কোনও দুঃখ-বেদনার স্মৃতিই অন্তরকে যখন আলোড়িত-বিগলিত করে, হাজার বেদনাবহ হলেও অপরূপ সুখানুভূতিতে সে-অন্তরকে তা রসময় করে তোলে, বরং সে-বেদনা যত গভীর, স্মৃতিচর্বণকালে তা তত মনোহর। রসদর্শনের ভৌমসত্যও তো তাই– "করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।" স্মৃতির সেই অপরূপ সুখানুভবই একমাত্র সত্য, আর সব তুচ্ছ হয়ে হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। তাই তো দৈবীচেতনাসর্বস্ব উনিশ শতকের শেষভাগেও (১৮৯০) গাড়োয়াল হিমালয়ের অতি কষ্টকর সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করে বদরিনাথদেবের সামনে পৌঁছে হিমালয়প্রেমিক জলধর সেনের কাছে পথে-পরিচয় হাজারো-মানুষ ও তাদের ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতার স্মৃতিই পথের কষ্ট এমনকি দেববিগ্রহদর্শন অপেক্ষাও মুখ্য হয়ে ওঠে। 'হিমালয়' গ্রন্থে তাঁর সেই স্মরণীয় উচ্চারণ শুনিঃ

"দেবমন্দির ও দেবতা পাষাণময়, কিন্তু যুগান্তর প্রবাহিত ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতায় তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, দেবমন্দির ও দেবতা অপেক্ষাও তাঁদের পুণ্য স্মৃতি অধিক সৌভাগ্যময়।"

এ প্রায় চারদশকের পুরনো স্মৃতি। পথঘাট ও যানবাহনব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ও সকল শহুরে-স্বাচ্ছন্দ্যময় অজস্র যাত্রীঠাঁইয়ের কোনও নিশ্চিন্তি বিশেষত গাড়োয়াল ভূমির তীর্থস্থানগুলিতে ছিল না তখন। ফলে গন্তব্যস্থানগুলিতে সীমা-ছাড়ানো ভিড়ের প্রবল ধাক্কাধাক্কিতে বাকসংযমহারানো শব্দদূষণের শঙ্কা কিংবা হাজারোজনের উচ্ছ্বসিত চিৎকারে প্রকৃতিসম্ভোগে নিমগ্ন যাত্রীর ধ্যানমগ্নতা ভেঙে খান খান হবার শঙ্কাও ছিল না, ছিল না বিগ্রহের পায়ে আত্মনিবেদনী-পূজা দেবার জন্য দু-তিন কিলোমিটার লম্বা লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে পাঁচ-সাত ঘণ্টা কী তারও অনেক বেশি সময় ধরে চরম বিরক্তি ও পদযুগলসহ সারা শরীরের কষ্টপূর্ণ অবস্থানও।

সেবার বৈশাখশেষে অক্ষয়তৃতীয়ায় (২৬ বৈশাখ, ১৩৮৫/১০ মে, ১৯৭৮) বাড়ি ছেড়ে তৃতীয়দিন মধ্যসকালে হৃষীকেশ বা ঋষিকেশ। পাহাড়িপথে পায়ের জড়তা কাটাতে পরদিন ভোরের বাসেই হরিদ্বার পৌঁছে চণ্ডী ও মনসাপাহাড়শীর্ষে একবার করে ওঠানামা (তখন কোনওটিতেই 'রোপওয়ে' বসেনি)। সমতলবাসীদের পক্ষে প্রস্তুতিপর্বেই পদযুগলের ঝালাই তাতে নেহাৎ কম হয়নি, নইলে উদ্বোধনেই স্যানাচটি-যমুনোত্রী ওঠানামায় চল্লিশ কিলোমিটারের ধকল নেওয়া যেত না। যমুনোত্রী দিয়েই সেবার শুরু হয়েছিল 'ঋষিকেশ টু ঋষিকেশ' প্রায় পাঁচসপ্তাহের গাড়োয়াল পরিক্রমা। চারধামের সঙ্গে মাঝপথের আরও অনেক ধামসহ ছোটোবড়ো সব দূরত্ব মিলিয়ে সেবার হন্টন প্রায় শ'তিনেক কিলোমিটার।

যাইহোক, যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ ঘুরে উত্তরকাশী ও রুদ্রপ্রয়াগে দিনছয়েক কাটিয়ে গৌরীকুণ্ডের বিজয় হোটেল। ভোরে হাঁটা লাগিয়ে জঙ্গলচটি, চীরবাসা-ভৈরবমন্দির, রামওয়াড়া, গরুড়চটি হয়ে বারোটার কিছু আগে নীলজল-মন্দাকিনীর জলপাইরঙা সেতু পেরিয়ে তার বামতীরে। গরুড়চটিতে ধুলোয় বসে একটা লোক ঢোলক বাজিয়ে একটানা বলে চলছিল– "চড়াইয়া খতম হো গৈল, চড়াইয়া খতম হো গৈল, কুছ পৈসা তো দিজিয়ে বাবুজী/মাজী।" হাঁটুয়া-যাত্রীরা চড়াইপথ শেষ হওয়ার আনন্দে তার সামনে পেতে রাখা কাপড়ে পাঁচ-দশ নয়া, কেউবা সিকিটা-আধুলিটা

কেদারনাথ মন্দির

ছবি- হরিসাধন দে অধিকারী

ছুঁড়ে দিতে কার্পণ্য করছেন না কেউই।

মন্দাকিনীসেতু পার হয়ে তখন একটাই ফুটপাঁচেক চওড়া পাথরবাঁধানো পথ কিছুটা বামে বেঁকে কালীকমলী- ধর্মশালা, গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের যাত্রীনিবাস আর হোটেল হিমলোকের পাশ দিয়ে সোজা কিলোমিটার খানেক দূরে মন্দিরচত্বরে গিয়ে শেষ হত। আর সে পথের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল দুদিকেই খাদ– বাঁদিকে ছ-সাত ফুট নিচে বরফ আর পাথরে ভরা কুলুকুলুরবণা মন্দাকিনীর খাত যার কিছু কিছু অংশে এখনও বরফের ছোটো ছোটো সেতু; আর ডানদিকেও ছ-সাত ফুট গভীর উপত্যকা-ভূমির খাদ। কোনও পাশেই কিনারা প্রাচীর বা Guardwall নেই। মন্দিরমুখী সে পথের সবখান থেকেই সামনে অবারিত দেখা যেত কেদারজীর অপরূপ শৈলীর মন্দির আর তার পিছনে মন্দাকিনীর উৎস চোরাবালিতাল বুকে নিয়ে তুষার-আভরণে সজ্জিত কেদার- পর্বতের ধ্যানগরিমাদীপ্ত শৃঙ্গদেশ। 'দশ-এ আবার যখন আসি, মন্দাকিনীর সেতু পেরিয়ে সে উদাত্ত দৃশ্য আর খুঁজে পাইনি, মন্দিরমুখী দুদিকেই খাদের সেই একফালি সোজা পথ তখন একাধিক সরু গলি পথে বিভক্ত– যাদের দুপাশে বিশাল বিশাল মাপের বহু দুতিনতলার পাকাবাড়ি। ফলে এখন উপরে তাকালে আগের সেই স্বর্গীয় দৃশ্যের বদলে দুপাশে শুধু কংক্রিট জঙ্গলের ছাদের কার্নিশ আর ইলেক্ট্রিক তারের সারি।

পুরনোদিনের প্রসঙ্গে আসি। দুপুর বারোটা নাগাদ উভয়পাশেই খাদের সেই পথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছনোর আনন্দ নিয়ে এগিয়ে চলেছি। বামে মন্দাকিনীর ওপারে পশ্চিম পাহাড়ের হিমবাহ গলে ক্ষীরগঙ্গা হয়ে এসে মিশেছে মন্দাকিনীতে। ওই ক্ষীরগঙ্গার পিছনের পাহাড় টপকে গেলেই পাওয়া যাবে বাসুকিগঙ্গার উৎস– বাসুকিতাল। সামনে আর আধ কিলো-মিটারটাক দূরে কেদারমন্দির আর তার পশ্চাৎপটের স্বর্গীয় দৃশ্য মনকে মাতাল করে রেখেছে। কেদারদর্শন সেরে বিপরীতমুখী পথে নেমে চলেছেন অনেকেই। বেশিরভাগই হেঁটে, কিছু ঘোড়ায় কিংবা ডাণ্ডি বা কাণ্ডিতে সওয়ার হয়ে। প্রসঙ্গত, তখন যাত্রীবাহী ঘোড়া, ডুলি ইত্যাদি সবকিছুই মন্দির পর্যন্ত যেত, সেতুর আগে যাত্রা শেষ করত না। বিপরীতমুখীদের, বিশেষ করে সওয়ার-বাহী ঘোড়াকে পথ করে দিতে কিঞ্চিৎ বাঁদিক ঘেষে চলা। হঠাৎই এক ছোটো খাটো বিপর্যয়। বছর পঁয়ত্রিশের এক স্থূলকায়া মাড়োয়ারি মহিলাকে নিয়ে এক তেজীয়ান সাদা ঘোড়াকে নেমে আসতে দেখে যথারীতি আমরা বামদিকে আর একটু সরে এগিয়ে চলছিলাম। কিন্তু আমার

প্রায় সামনে এসে 'হয়' মশাইয়ের যে **'always keep left'** ট্রাফিকরুল না মেনে এপাশে চলে আসার মর্জি হবে, তা কে জানতো! অতএব অনিবার্য সংঘর্ষ রোখা যায়নি। তার দক্ষিণউদরের ধাক্কায় আমি ফুটসাতেক নিচে পপাত মন্দাকিনীখাতে বরফ আর পাথররাশির মধ্যে। ডানপায়ের পাতা প্রায় মুচড়ে যাবার মতো, যন্ত্রণা অকহতব্য। সেই চিৎপটাং অবস্থাতেই মিনিট পাঁচেক পায়ে নরম বরফ ঘষে অতিকষ্টে পথে উঠে হাঁটতে গিয়ে বুঝেছিলাম অবস্থা শোচনীয়। সৌভাগ্যক্রমে সে-সময়েই দেখা হয়েছিল গঙ্গোত্রীতে পরিচয় ফিরতি-পথগামী হোমিওডাক্তার রমেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে। সব শুনে জিভে এক ফোঁটা আর্ণিকা-দুশ, ফেলে তিনি নেমে গেলেন।

অতি কষ্টে খুঁড়িয়ে বাকিপথ এসে উঠেছিলাম পাণ্ডা মহাদেওপ্রসাদ শর্মার তত্ত্বাবধানে থাকা উমাপ্রসাদের বাড়ি যোগমায়া আশ্রমের দোতলার একটা ঘরে। মন্দিরের ৫০/৬০ ফুট আগে। ইচ্ছা ছিল পরদিন সকালে কেদারজীর পুজো দিয়ে দিন শুরু করব। কিন্তু ভয়াবহ পদস্ফীতিতে পরদিন কেন, পরবর্তী কয়েকদিনই হয়তো পায়ের ব্যবহার অনিশ্চিত। মাত্র মাসতিনেক আগের স্মৃতি এখনও দগদগে। নৌকোয় হলদি নদী পার হবার সময় গলুইয়ে পিছলে পড়ে ডানপায়ের পাতা এমনই ফুলেছিল যে টানা দশদিন শয্যাপ্রেমী হতে হয়েছিল।

অতএব মনস্থির করে তখনই মহাদেও-জীর মন্দিরসম্মুখে পুজোর ডালি ও পুরীসবজির দোকান থেকে ডালা কিনে তাঁরই পৌরোহিত্যে ফাঁকা মন্দিরে পুজো দিয়ে দিলাম। তখন দেড়টা। কীভাবে একপায়ে দোতলাবাড়ির এবং মন্দিরের বেশকিছু খাড়াসিঁড়ি ওঠানামা করে দুই নন্দী ও পঞ্চপাণ্ডব ইত্যাদি মূর্তির পাশ দিয়ে গর্ভগৃহে পৌঁছেছিলাম— নিজেই জানি না। এইসঙ্গেই বলে নিই— সেদিন সন্ধ্যাতেও আকুলিবিকুলি মন আর পায়ের অন্তিম দুরবস্থা নিয়েও সন্ধ্যারতি ও রাজবেশ দেখার জন্য ঘর থেকে কীভাবে যে মন্দিরে পৌঁছেছিলাম— সেও এক বিস্ময়। বিকেলে ঘণ্টাদুয়েক প্রবল বৃষ্টি ও শিলাপাতে চারপাশ তখন তুষারশুভ্র, শূন্যের নিচে তাপমাত্রায় ঠান্ডার কামড়ও তেমনই। জানি না, সেদিন নানান প্রতিকূলতাতেও এতখানি মনোবল কীভাবে পেয়েছিলাম!

মন্দিরগর্ভে মহিষের অধোপৃষ্ঠদেশের আকারের ঘি-সিঁদুর-চন্দনলেপিত বিশাল এক অসমতল শিলাখণ্ডই কেদারশিলা। চারপাশ রুপোয় বাঁধানো, উপরে রুপোর ছাতা, এককোণে জ্বলছে অক্ষয়-জ্যোতিধারক এক বিশাল প্রদীপ। প্রতিবছর দেওয়ালিতে মন্দিরদ্বার বন্ধের প্রাক্কালে প্রদীপভর্তি ঘি ঢেলে দেওয়া হয়। বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ায় চত্বরের কয়েকমিটার পুরু বরফ সরিয়ে মন্দিরদ্বার খোলার পরও দেখা যায় প্রদীপ একইভাবে জ্বলছে। অক্ষয়জ্যোতি দর্শনের জন্য তাই এখানে বিশাল যাত্রিসমাগম হয় অক্ষয়তৃতীয়ায়। পথ বরফাচ্ছাদিত থাকায় যাত্রীদের তখন ফাটা বা নালা, কোনও বছর গুপ্তকাশী থেকেও হেঁটে আসতে হয়। পুজো-দানকালে শিলাস্পর্শে যে দিব্য- শিহরণের অনুভব, তা বোধহয় কোনওদিনই ভুলব না।

পুজোর পর মহাদেওপ্রসাদই তাঁর দোকানে আমাদের দুজনের মাত্র পাঁচ টাকায় গরম পুরীসবজি-হালুয়ায় ভরপেট মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন, সেইসঙ্গে ফোলাপায়ের জন্য চূণ-হলুদ গরম করে এবং মন্দিরের উত্তরচাতালের 'আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়' থেকে তিরিশ নয়া পয়সায় ছটি ছাইরঙা বড়ি এনে দিয়েছিলেন দুঘণ্টা অন্তর খাওয়ার জন্য। এসবের কল্যাণে দুপুর-বিকেল জুড়ে টানা তিনঘণ্টা যন্ত্রণা ভুলে ঘুমোতেও পেরেছিলাম। আর পরমাশ্চর্যের, বরং বলা চলে অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে—রাত পর্যন্ত পায়ে প্রবল ফোলা এবং অসহনীয় ব্যথা থাকলেও পরদিন সাতসকালেই সেসব এমনই উধাও যে মহাদেওজীর কিশোরপুত্র কেশবচন্দ্রপ্রসাদ ও তারই সমবয়সী বন্ধু পাশের দোকানির ছেলে পুস্পেন প্রকাশের যুগ্ম-পথ প্রদর্শনে জোরহন্টনে ঘুরে এলাম মন্দিরের পিছনে মন্দাকিনীতীরে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও তাঁরই সমাধি ভূমি। সেই সঙ্গেই পূর্বদিকের কালভৈরব পাহাড়ের তুষার মাড়িয়ে পাঁচ/ছ'শ ফুট ওপরে ভৈরবমন্দির— যেখানে আছে রুপোলি রঙমাখানো শিলায় সিঁদুরচন্দনচর্চিত ভৈরব ও পার্বতীর মূর্তি। উপর থেকে গোটা কেদারজনপদের চারপাশের দৃশ্য ভোলার নয়। তখন সাড়ে আটটা। সেখান থেকেই দেখছিলাম— মন্দিরে পুজো দেবার জন্য সর্পিল লাইন উত্তরচাতালের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বিত। সকাল আটটায় পুজো-দানপর্ব শুরু হয়েছে। দিনের এই সময়টাতেই পুজো দেবার ভিড় সবচেয়ে বেশি। কাল দুপুরে শুনসান মন্দিরে পুজো দিতে পারার জন্য নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। তাহলেও সর্পিল লাইনে দাঁড়ানো মানুষের সংখ্যা সত্তর-আশির বেশি কখনওই নয়। একেবারে পিছনের মানুষের গর্ভগৃহে পৌঁছতে সময় বড়জোর ঘণ্টাদেড়েক। এর সঙ্গে গত দশের কেদারের স্মৃতিকে কিছুতেই মেলাতে পারি না। পুজো দিতে যাত্রীদের লাইন বেয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার পিছনে দাঁড়াতে হয়েছিল। ঘড়িতে তখন সকাল দশটা। গর্ভগৃহে ঢোকার সুযোগ পেলাম বিকেল সাড়ে তিনটেয়। লাইন দ্রুত না এগোবার আরও একটা কারণ হল— ফাটা থেকে ঠিক ছ'মিনিট পরপর হেলিকপ্টারে উড়ে আসা যাত্রীদের উড়ানটিকিট দেখিয়ে সরাসরি

মন্দিরে প্রবেশের অগ্রাধিকার-প্রদান।

যাইহোক, ভৈরবপাহাড়ের উপরে আধঘণ্টা কাটিয়ে নেমে এসে বাসনা জাগল— আজ সারাদিন যখন কেদারেই আছি, তখন যাতায়াতে চোদ্দ-পনেরো কিলোমিটার বাসুকিতাল ঘুরে এলে মন্দ হয় না। বড়জোর ঘণ্টা পাঁচ-ছয়ের ব্যাপার। পায়ের স্বাভাবিকতা তখন প্রশ্নাতীত, —যেন কালকের ঘটনাটা ঘটেইনি। কিন্তু মহাদেওজী নিরাশ করলেন। বাসুকি-তালের পথ এখন প্রচুর বরফে খুবই দুর্গম, তাছাড়া পথে বেশ কিছু চোরাগহ্বর কিংবা ফাটল আছে যার উপর বরফ পড়ায় এখন বোঝা যাবে না, কিন্তু উপরে পায়ের চাপ পড়লে বরফ ভেঙে তলিয়ে যাওয়া অনিবার্য। গতকালকের বিকেল ও রাত্রের বৃষ্টিতে আরও বরফ জমেছে। জানালেন বাসুকিতাল যাওয়ার সেরা সময় হল আগস্ট থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি। সুতরাং...। শুধু ক্ষীরগঙ্গার উপরের পাহাড় থেকে ঘুরে আসব শুনে সম্মতি দিলেও সাবধানও করে দিলেন যেন সেটুকুর মধ্যেও কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় বুঝলে দ্বিধা বা জেদ না করে অবশ্যই ফিরে আসি। রমেশদেরও তেমনই নির্দেশ দিলেন। বাসুকিতাল থেকে বাসুকিগঙ্গা বেরিয়ে নিচে শোনগঙ্গা নাম নিয়ে শোনপ্রয়াগে মন্দাকিনীতে মিশেছে, —সে সঙ্গমস্থল দেখেও এসেছি। মন্দাকিনী পেরিয়ে ক্ষীরগঙ্গার পাশ দিয়ে কিছু পাথর কিছু বরফ মাড়িয়ে উপরে উঠে সে এক অ-পূ-র্ব দৃশ্য। পরবর্তী গোটা চড়াইপথ ও পাহাড়ের গা-মাথা ঢেকে শুধু বরফ আর বরফ। মেঘহীন সূর্যালোকে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, পুরু রোদচশমা ছাড়া এ-অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়; তুষারান্ধ (Snow-blind) হওয়ার সম্ভাবনা তাতে খুব বেশি। তাছাড়া বারোটাকা সাতষট্টি পয়সার BSC কেড্‌স্ সম্বল করে এ পথে পা-বাড়ানো অনিবার্য মৃত্যুরই নামান্তর। রমেশদের বলতে হল না, নিজেই থমকে দাঁড়িয়ে মিনিট বিশেক সামনের স্বর্গীয়দৃশ্য আর পিছনের কেদারমন্দিরের লাবণ্যপূর্ণ আর এক অধরামাধুরী প্রাণভরে উপভোগ ও তাঁদের প্রণাম করে ফেরার পথ ধরলাম।

ধর্মপ্রাণ কোনওদিনই নই, হিমালয়ের অতলান্ত সৌন্দর্যগরিমায় আপ্লুত হতেই তার পথে পথে বারবার ছুটে যাই। কেন অত দূরে?— 'Because it is there.'। যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী বা অন্যান্য হিমতীর্থের কথা স্মরণে রেখেও বলি— কেদারভ্রমণে এক বিশেষ অনুভূতি কেন জানি না মনকে বড়ো নাড়া দিয়েছে। সেখানে যেন স্বতঃ উপলব্ধি ঘটেছে যে, —যুগযুগ ধরে মানুষ কেন হিমালয়কে দেবভূমি স্বর্গের স্থানে বসিয়েছে? মনে হয়েছে-- এই ভৌম-পরিবেশের সুবিশালত্বের পটভূমিকায় এসে আস্তিক যাঁরা, তাঁরা তো অবশ্যই খুঁজে পান লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ তাঁদের প্রাণেশকে, আর যাঁরা নাস্তিক, তাঁরা খুঁজে পান নিজেদেরকে, তাঁদের আত্মিক স্বরূপকে— যে আত্মদেশ পরমাত্মারই এককণা অংশ; আমিত্বের সংকীর্ণতাকে একান্তভাবে উপলব্ধি করে তাঁরাও অন্তরভরে পেতে চান অসীমের মহিমাগরিমার পরশ! এও তো মনো-জগতের এক সুমহান উত্তরণ, যা তৃ (= তরণ> উত্তরণ) ধাতুজাত তীর্থভূমির সারকথা। ঈশ্বর বলে কেউ মানুক আর নাই মানুক, চরাচরপ্রকৃতি জুড়ে এক অদৃশ্য বিরাট শক্তির (Supreme Power) অনুভবে উত্তরণের দোরগোড়ায় তা কিন্তু নাস্তিক-আস্তিক— আমাদের সবাইকে অনায়াসেই পৌঁছে দেয়।

ড. দিলীপকুমার দত্ত

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। জীবনের দীর্ঘ সময় হিমালয়ের প্রান্তরে প্রান্তরে পায়ে হেঁটে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। সেসব— নিয়ে লেখালেখিতে অসীম আগ্রহ।

লেখকদের প্রতি

'গণ্ডীছুট' পত্রিকায় ভ্রমণ সম্পর্কিত লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল—

- এ-ফোর মাপের কাগজে এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে উপযুক্ত মার্জিন এবং দুটি লাইনের মাঝে উপযুক্ত ফাঁক রেখে লেখা পাঠাবেন।
- লেখা ১৪০০ থেকে ১৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া কাম্য।
- অনুরোধ লেখার জেরক্স বা কার্বন কপি পাঠাবেন না।
- লেখকের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অবশ্যই লিখবেন। ই-মেল থাকলে জানাবেন।
- লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখবেন।
- ছবি থাকলে সিডি অথাব পত্রিকার ই-মেলে পাঠাবেন।
- ছবি ৩০০ ডিপিআই রেজুলিউশনের হতে হবে। প্রিন্ট ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে ক্যাপশান পাঠাবেন অবশ্যই।
- লেখা বা ছবি পত্রিকার ই-মেলে (অ্যাটাচ করে) বা নিচের ঠিকানায় পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
ড. হরিসাধন দে অধিকারী
বি-৬/৮৭,
কল্যাণী, নদিয়া
পিন-৭৪১২৩৫
ই-মেল
gandichhut@gmail.com
harisadhan.deadhikari@gmail.com

বসুধারার সুধা

মেঘনা রায়

বসুধারা ফলস্ ছবি- লেখিকা

২০০৭-এর মধ্যআশ্বিনে বয়স্ক মাসিমা-মেসোমশাই এবং আরও কিছু বন্ধুস্বজন নিয়ে 'কেদারবদ্রী তীর্থযাত্রা' শিরোনামে বেড়িয়ে পড়েছিলাম আমরা। তবে একেবারে টিপিক্যাল তীর্থযাত্রার রকমফের তৈরী করতে কমবয়সীদের জন্য উপরি পাওনা হিসেবে রাখা হয়েছিল বদ্রী থেকে মানা গ্রাম হয়ে 'বসুধারা' জলপ্রপাত যাওয়ার অসাধারণ হাঁটাপথটুকু এবং 'কেদার' যাওয়ার পথে মাস্তুরা থেকে সারি গ্রাম হয়ে চৌখাম্বার কোলের কাছে বসে থাকা 'দেওড়িয়া তালে' যাওয়ার আকর্ষণীয় রাস্তাটিকে।

কানে লেগে রয়েছে আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্তোত্র পাঠে আগমনীর মায়াজাল আর পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে সাবেকি ঢাকের বোল। আমাদের এই শারদসফরে শিয়ালদা-রাজধানী যখন শেষ বিকেলে কাশের বৈভবে ছেয়ে থাকা মাঠ পেরোনোর হুইসেল দিচ্ছে তখন আমার মন ভাবছে; কয়েকদিনের জন্য সংসার গুটিয়ে চলেছি হিমালয়ের অলিন্দে, পাহাড় ছেড়ে থাকার নির্বাসনের পালা ফুরিয়ে এলো বলে।

ছলাৎ ছল্, ছলাৎ ছল্ গল্প বলে নদীর জল; হরকিপৌড়ি ঘাটের গল্প বলা গঙ্গাকে বিদায় জানিয়ে সকাল সকাল রওনা দিলাম বদ্রীনাথের উদ্দেশে। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ এই পরিচিত জায়গাগুলোকে গাড়ির পিছনের উইন্ডোফ্রেমে বিদায় জানিয়ে অবশেষে ঘন বিকেলে বদ্রীনাথে পৌঁছে রাতের আশ্রয় নিলাম নদী অলকানন্দার পারে 'নন্দাদেবী গেস্টহাউসে'। আলো ঝলমলে রাতের বদ্রীনাথে চোখ রেখে মনে হল একযুগ আগের মাইল ফলক পেরিয়ে প্রথম দেখা সেই

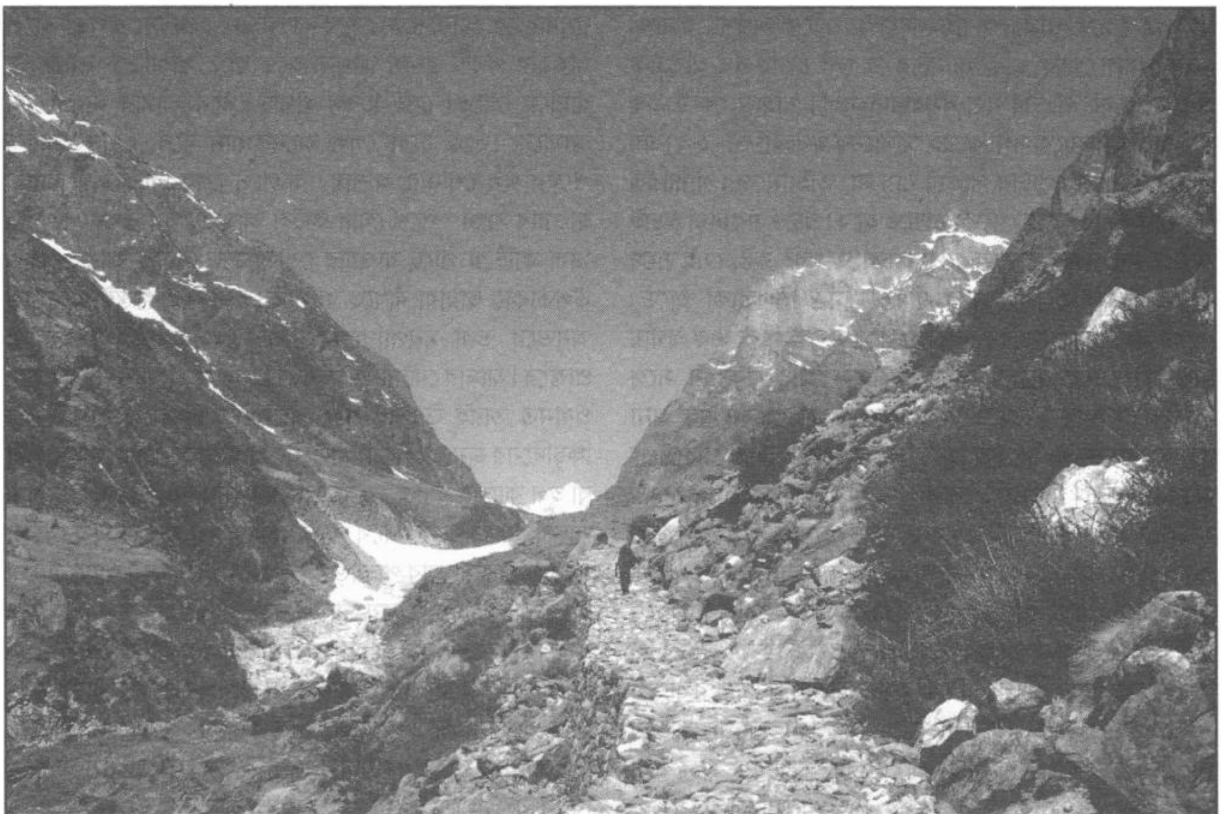

বসুধারার পথে

ছবি- পার্থ বসু

ভোরের বদ্রীসফর সত্যিই কোনও দিনই আর ফিরবে না। বর্তমান বদ্রীর নগর উন্নয়ন বড় বেশি প্রগতিশীল; তাই এই বর্ধিষ্ণু জনপদের দেবতার মনের খোঁজ বড় একটা কেউ রাখে না। চাকচিক্যের ভিড়ে তিনি সরে গেছেন পর্বতের আরও গভীরে। বড়ো বড়ো হ্যালোজেন লাইট নিয়ে আধুনিকতার হাত ধরে বদ্রী আজ ডিশ অ্যান্টেনার শহর হয়ে উঠেছে, হোটেল-রেস্তোরাঁ অসংখ্য দোকানপাট নিয়ে বদ্রী এককথায় জমজমাট।

হোটেলের আলোর রোশনাইতে ডিনারপর্ব শেষ করে, গেস্টহাউসের পিছনে নদীর ভাঙাচোরা কিনারায় দাঁড়িয়ে অপার্থিব এক ক্যানভাস দেখে বাকরোধ হবার উপক্রম, প্রকৃতি অকৃপণ হাতে মায়াবর্ধন করে আবারও যেন স্মরণ করিয়ে দিল তার রূপমাধুর্যের কাছে মানুষ কত ক্ষুদ্র– নশ্বর। দু-একদিনের মধ্যেই কোজাগরি, তাই চাঁদের বিকিরণের স্বপ্নিল জ্যোৎস্নায় রুপোর মতো ঝক্ ঝক্ করছে 'নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ'। মনে হচ্ছে যেন অজান্তেই এসে পড়েছি হিমালয়ের হৃদয়ে– হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে হৃদয়ের স্পর্শ। দুচোখ সার্থক হল দেবভূমিতে চাঁদের পাহাড় দেখে, এই চন্দ্রাহত রাতে মন যেন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে রইল পাহাড় পর্বতের সংসার বাসে।

পরদিন খুব সকালে দেখি বদ্রীশহর সবে আড়মোড়া ভাঙছে, ভোরের সোনালি স্নিগ্ধ রবিরশ্মি যেন স্নান করাচ্ছে নীলকণ্ঠকে। হেমন্তের ছোঁয়ায় শীতের দাপট দারুণ তীব্র, জানালার কার্নিশে, ইলেকট্রিক তারে প্রায় সর্বত্রই ঝুলন্ত তুষার নকশা। মনে অনেক সাহস সঞ্চয় করে তপ্তকুণ্ড থেকে বাহিত জলে স্নান করলাম। পুণ্য সঞ্চয়ে এতটুকু ঢিলেমি দেব না এইবার। শুদ্ধচিত্তে ও মননে বদ্রীবিশালের পুজো দিলাম। পুজোর শেষে প্রাতরাশের পাট চুকিয়ে উপরি পাওনার দিকে রওনা দিলাম। আজকের গন্তব্য বদ্রী থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে মানা গ্রাম হয়ে, সেখান থেকে আরও ৭ কিলোমিটার হাঁটাপথ অতিক্রম করে বসুধারা জলপ্রপাত দর্শন।

অলকানন্দার পার ধরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মানা গ্রামের খেলনার বাড়িঘর। পুরাণের গন্ধর্ব আজকের মার্চা সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে এই গ্রামে। তিব্বতের পথে ভারতীয় শেষ বসতি হল এই 'মানা'। গ্রামের শেষ প্রান্তে যেখানে সরস্বতী নদী মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে সেই জায়গাটির নাম কেশবপ্রয়াগ। এই কেশবপ্রয়াগে একটি বাহারি চায়ের দোকানে টুকিটাকি

মালপত্র রেখে আমরা সবাই বসুধারার দিকে অগ্রসর হলাম। কেশবপ্রয়াগ থেকে ৭ কিলোমিটার কেবলই চড়াই পথ অতিক্রম করলে তবেই পাওয়া যায় বসুধারার সুধা। পাহাড় কেটে এক ফালি দুর্গম রাস্তাকে সঙ্গী করেই আমাদের পথচলা শুরু হল। এই পথে ঘোড়া বা পোর্টার পাওয়া যায় না, তাই নিজের শারীরিক ক্ষমতার ওপর আস্থা রেখেই চলতে হবে। প্রচণ্ড একটানা চড়াই ও বোল্ডার ফেলা বসুধারার পথে চলতে খুবই কষ্ট, সেই সঙ্গে রয়েছে হিমশীতল হাওয়ার দাপট সমস্ত উপত্যকা জুড়ে। বিস্ময়করভাবে পাথুরে রুক্ষতা এখানে সুস্পষ্ট এবং এক স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা ছেয়ে রয়েছে সর্বত্র। পাহাড় আর প্রকৃতির সঙ্গে চোখের মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে মনে হচ্ছে, এ যেন এক অন্য অনুভব, অন্যকষ্ট, নিজের তিল তিল অনুভূতি দিয়ে পাহাড়কে আবিষ্কার করা। মাথার ওপর নীল ডানা মেলা আকাশে, সূর্যের আলোয় ভর করে মেঘ যেন পাড়ি জমাচ্ছে সুদূরবিস্তারী পর্বতশৃঙ্গে। এই ঝকঝকে নীলাকাশের মসলিন ওড়না মাথায় দিয়ে আমরা গুটি গুটি চলেছি এগিয়ে। উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে গুল্মজাতীয় গাছের অস্তিত্বও নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ক্রমশ। চতুর্দিক থেকে তুষারাবৃত শিখরশ্রেণী ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে বলছে– এখনও যে অনেক গল্প বলা বাকি। শনশনে হাওয়া পাঠিয়ে পাহাড় যেন কাছে ডাকছে আমাদের। নিসর্গের হাটখোলা প্রান্তরে ধুলি-ধোঁয়ার কালিমা নেই, শব্দদূষণের বালাই নেই, তাই অনেক দূর থেকেই বসুধারার ক্ষীণকায় রূপ দৃশ্যমান। কিন্তু যতই কাছে যাই সে যেন ততই দূরে সরে যায়। ক্রমশ প্রকাশ্য বাঁদিকের নারায়ণ পর্বতমালা এবং ডানদিকের নরপর্বতমালার মাথার ওপর দিয়ে কুইন অফ গাড়োয়াল 'নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ' স্বমহিমায় তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। অবশেষে এক দুর্দান্ত চড়াই-এর শেষ বাধাটুকু পার করে আমরা একেবারে বসুধারার দোর গোড়ায় পৌঁছে গেলাম।

গাড়োয়ালের বহু অনামী সুউচ্চ শৃঙ্গসকল অর্ধবৃত্তাকারে বসুধারাকে ঘিরে রেখেছে। এই পাহাড়কে যতই ক্যামেরা-বন্দী করি না কেন, সে যেন আরও বিশাল ও মহিমাময় হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। প্রায় ৪৪ ফুট উঁচু এক অদৃশ্য সুপ্তগহ্বর থেকে এই ধারার সূত্রপাত। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের আলোককণা সেই জলধারায় সাতরঙা রামধনু হয়ে খেলা করছে। নগর সভ্যতা থেকে অনেকদূরে নিরালা বসুধারার পাদদেশে আমরা সবাই। মনে হচ্ছে শুধুমাত্র পথের কষ্ট সহ্য করেই এই পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। এই অনাবিল আনন্দের প্রতিটি পলকে জীবনের একঘেয়ে কেজো বৃত্তের মাঝে প্রাণপণে ধরে রাখার প্রয়াসটুকু চালিয়ে যাই। বসুধারার ঠাণ্ডা জলধারার স্পর্শে শারীরিক গ্লানির অনেকটাই যেন মিলিয়ে গেল। সজল নয়নে দেখলাম বসুধারাকে ডানদিকে রেখে লক্ষ্মীবন হয়ে সতোপন্থ তালে যাওয়ার পথটি ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে পাহাড়ি বিভাজিকায় হারিয়ে গেছে। সেই চিকন পথটি বেয়ে আমার মনও যেন আমাকে ছেড়ে চলে গেল অনেকখানি দূরে, কোন অজানা পথের গল্প শোনার আশায়। বাতাসে শেষ বিকেলের বিদায়ী হাওয়ার ঠাণ্ডা স্পর্শে ঘোর কাটল আমার। সূর্য তখন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পাটে যাওয়ার তোড়জোড় করছে আর পাহাড়ি উপত্যকায় ছায়ারা বাঁধছে রহস্যময় জোট। একান্তই ব্যক্তিগত অনুভবে ভরা মনপাখিকে উড়িয়ে দিলাম নিঃসঙ্গ পাহাড়ি প্রান্তরে। আমার বেটার-হাফের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ছেয়ে গেল, প্রধানত তারই উৎসাহ ও বেড়ানোর আকুলতা থেকেই তো কিছুদিনের জন্য হলেও হিমালয়ের প্রাঙ্গনে আমাদের মুক্তি। নাই বা হল ক্লাবের দারুণ ফেস্টুন নিয়ে শৃঙ্গবিজয়; এ যেন ঘরোয়া সাংসারিক জীবনের পথে পড়ে থাকা সুন্দর পাওনাটুকুই কেবল কুড়িয়ে নেওয়া আর পাহাড়ি বাঁকে অবলীলায় ফুটে থাকা নাম না জানা ফুলের দিকে চেয়ে ভাবা– কবে আবার শুরু হবে সামনের বছরের প্রস্তুতি। হিমালয়ের অন্তঃপুরে আমি আসি বিস্মিত হতে, আসি পাহাড়ি মেঠো পথের সন্ধানে যেখানে এখনও রাজপথের ছায়া পড়েনি। প্রতিবারই উপলব্ধি করি এক নতুন জীবনদর্শন, তাই প্রার্থনা থেকে যায় মনে– পাহাড়ের কবিতা শুনতে যেন ফিরে ফিরে আসতে পারি এই নিরালা ঠাঁইয়ে।

ফিরে এলাম কেশবপ্রয়াগের চায়ের দোকানে। দোকানি পরিবেশন করল ধূমায়িত চা আর তার সাথে আমাদের গ্রুপের শ্যামলী বউদি দিলেন মধু। পাহাড়ের সাদা বলয়ে এক অনিন্দ্যসুন্দর দ্বিপ্রাহরিক মধ্যাহ্নকে দারুণভাবে উপভোগ করে ভারাক্রান্ত মনে গাড়ির দিকে ফিরে চললাম। চলে এসেছি সফরের শেষ সূচিতে– চল মন নিজ নিকেতনে। দিনের শেষ তাই ঝাপসা চোখের লেন্সে লেগে রইল মহান পর্বতমালা, গ্লেসিয়ার, মহাকাব্যের আখ্যানে বাঙ্ময় বসুধারা, তুষারে ঢেকে থাকা উত্তুঙ্গ চরাচর, হিমালয়ের নিয়মমাফিক মেঘ-রৌদ্রের খুন-সুটি আর সরলরৈখিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত পাহাড়িয়া মানুষগুলির জীবনগাথার কোলাজ।

মেঘনা রায়

দেশ-বিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখার নেশা।

অনবদ্য রম্ভা

রত্না ভট্টাচার্য

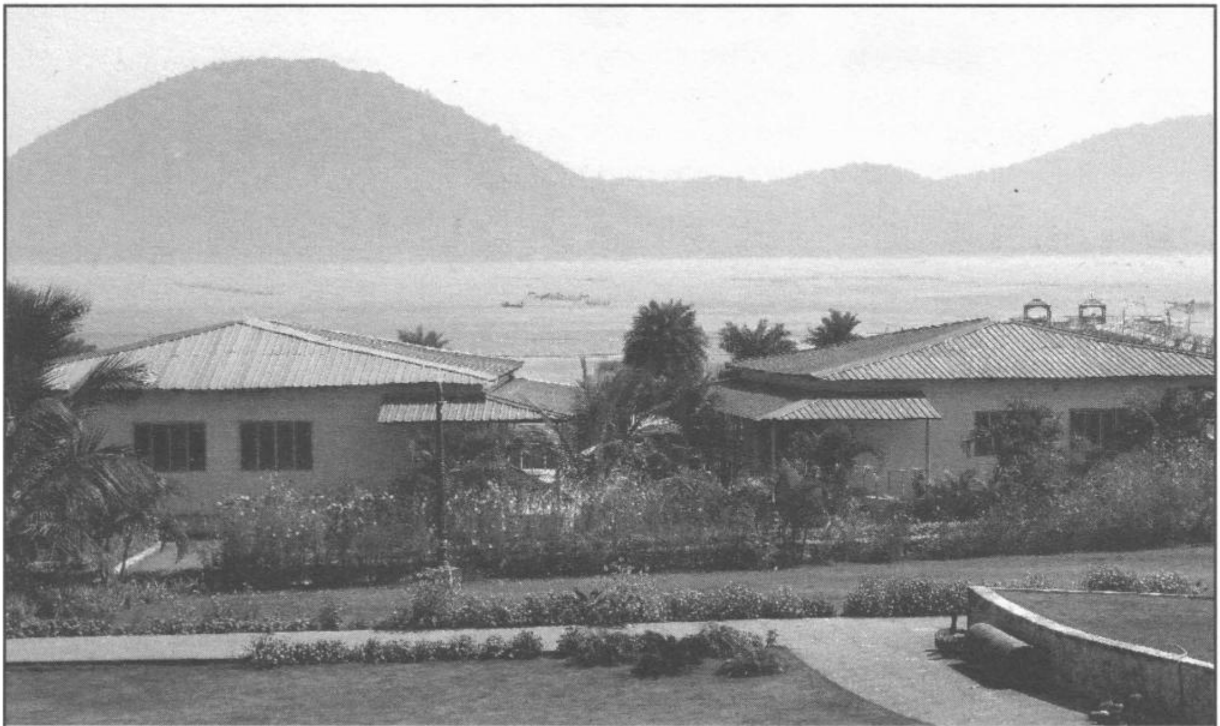

পান্থনিবাস ছবি- শক্তিপদ ভট্টাচার্য

সৌন্দর্য কি কেবল অজানা সুদূরেই! কাছে-পিঠেই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে টুকরো টুকরো পৃথিবী– অনন্য আকর্ষণের ডালি সাজিয়ে চুপচাপ নিভৃতে ধ্যানমগ্ন। এমনই এক জগত খুঁজে পেয়েছিলাম রম্ভাতে। উইক-এন্ড-এর ছুটি কাটাতে অনবদ্য। গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে আমরা চার বন্ধু চেপে বসলাম তিরুপতি এক্সপ্রেসে। আমাদের গন্তব্য রম্ভা। ওড়িশার গঞ্জাম জেলার এক অপরূপ লাবণ্যময়ী স্থান। এ রম্ভা দেবরাজ ইন্দ্রের আসরে নৃত্য পটীয়সী অপ্সরা রম্ভা নয়, যে দেবতাদের মনে ঢেউ তুলত। এ রম্ভাও ঢেউ তোলে তবে তা চিল্কার বুকে, পর্যটকদের মনে।

হাওড়া থেকে রাত ঠিক সাড়ে এগারোটায় ছেড়ে বেলা একটায় তিরুপতি আমাদের পৌঁছে দিল রম্ভাতে। রম্ভা স্টেশন থেকে ওড়িশা ট্যুরিজমের পান্থনিবাস মাত্র ৩ কিলোমিটার। অটোয় করে ১৫ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম পান্থনিবাসে। কলকাতার উৎকল ভবন থেকে শর্মিলা আগেই ঘর বুক করে রেখেছিল। পান্থনিবাসের অবস্থানটি বড়ো চমৎকার, একদম চিল্কার ধার ঘেঁষে। বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে পান্থনিবাস। মরসুমী ফুল ও পাতাবাহার গাছের সমাহারে পান্থনিবাসের রূপ আরও খুলে গেছে। বাগান সংলগ্ন পার্কে রয়েছে বাচ্চাদের নানা ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা। পান্থনিবাসের ঘরগুলি সব লেকমুখী। ঘর বা বারান্দা থেকে চিল্কাকে দারুণভাবে উপভোগ করা যায়। বারান্দায় বসে আদিগন্ত চিল্কার জলে অজস্র পাখিদের ভেসে বেড়ানো, দূরে পাহাড়ের আবছা আউটলাইন, নৌকা আর মাছ ধরার জাল নিয়ে জেলেদের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে সময় যে কখন গড়িয়ে যায় খেয়ালই থাকে না।

অলসভাবে সময় কাটানোর উপায় নেই কারণ পেট জানান দিচ্ছে তার এবার কিছু রসদ দরকার। অতএব বড়ো বড়ো পা ফেলে সটান ডাইনিং হলে। পেট পুরে তৃপ্তি ভরে খেয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম চিল্কার উদ্দেশ্যে। মঞ্জরীর ফোটো তোলার খুব শখ। যেখানে যা পাচ্ছে সবই ক্যামেরা বন্দী করতে ব্যস্ত।

ওর পিছনে না দৌড়ে আমরা তিনবন্ধু এগোতে লাগলাম। পান্থনিবাসের পিছনের বাগান পেরিয়ে একটি টকটকে লাল রঙের বাঁধানো রাস্তা সোজা চলে গেছে জেটি ঘাটের দিকে। জেটি ঘাটটি একেবারে চিল্কা হ্রদের বুকের ওপর। বসার ব্যবস্থা ভালোই। বাঁধানো চেয়ার রয়েছে। জলের বুকে ভাসছে অনেক নৌকা এবং রঙিন স্পিড বোট। রিন্টু আবার ভূগোলের শিক্ষিকা। ওর কাছ থেকে জানা গেল, আমরা চিল্কা নামে ডাকলেও স্থানীয় মানুষের কাছে তা চিলিকা যার অর্থ 'জলে ঢাকা মাটি'। প্রায় ১,১০০ বর্গ কিলোমিটার নিয়ে গড়ে ওঠা এই হ্রদটি এশিয়ার বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ। লোকমুখে হ্রদ হলেও এটি আসলে উপহ্রদ। এই সুবিশাল জলাশয়টি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক চিলতে জলপথে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত। এই সামান্য কলঙ্কটুকুর জন্য বেচারা চিলিকা হ্রদের সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। অতীতে এই সমগ্র অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের অংশ থাকলেও একখণ্ড লম্বা চড়া সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এই উপহ্রদকে। আজও বেড়ে চলেছে সেই বালির চড়া। চিলিকার সঙ্গে সাগরের সব সম্পর্ক বন্ধ করে দিতে চাইছে। বন্ধ করে দিতে চাইলেও বর্ষাকালে স্ফীত হয়ে উপহ্রদটি দৈর্ঘ্যে ৭২ কিলোমিটার আর চওড়ায় ১৬ কিলোমিটার হয়। শীতকালে পরিযায়ী পাখির মেলা বসে যায়। ১৯৭৩ সালে চিলিকা স্যাংকচুয়ারির মর্যাদা পেয়েছে। রিন্টুর কথাগুলো শুনছিলাম বললে ভুল বলা হবে। বলা উচিত গিলছিলাম। হঠাৎ সম্বিত ফিরল মাঝির ডাকে। সে আমাদের ঘোরাতে চাইছে তার নৌকায় করে। চারজনের কেউই তেমন সাঁতার জানি না। বুক দুরু দুরু করলেও চিলিকার বুকে ভেসে বেড়ানোর লোভ সামলানো গেল না। মাঝির আশ্বাসে তার নৌকায় চেপে স্থির হয়ে বসে চারিদিক দেখতে লাগলাম। মৃদুমন্দ হাওয়ায় তির তির করে জলে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। স্বচ্ছনীল জলে চিলিকার বুকে জেগে আছে সারি সারি পাহাড়। সামনের পাহাড়টির নাম ঘণ্টাশিলা। এই পাহাড়ের পিছন দিক থেকেই সূর্যোদয় হয় আর বিকেলে সূর্য যখন পাটে বসে– সে দৃশ্য ভোলার নয়। চিলিকার বুকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দ্বীপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পান্থনিবাসের দোতলার বারান্দা থেকে যে দ্বীপটি দেখা যায়, সেটি হল ব্রেকফাস্ট আইল্যান্ড বা বেকন আইল্যান্ড। এছাড়াও রয়েছে বার্ডস আইল্যান্ড, হানিমুন আইল্যান্ড, সোমোলো আইল্যান্ড প্রভৃতি।

ব্রেকফাস্ট আইল্যান্ড পেরিয়ে নৌকা ভিড়ল বার্কস আইল্যান্ডে। শীতে পরিযায়ী পাখির দল এই দ্বীপে আসর জমায়। কয়েকমাস কাটিয়ে বসন্তে ফিরে যায় উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে। বাঁশের জেটি বেয়ে দ্বীপে নামলাম। নেমেই চমক। এক বিশাল ডাইনোসরের মূর্তি রয়েছে। আরও নাকি বসবে। এতে পর্যটক আকর্ষণ বাড়লেও পাখিদের আকর্ষণ যে চলে যাবে একথা বলাই বাহুল্য। অনেকে নাকি বার্ডস আইল্যান্ড নামের পরিবর্তে 'ডাইনোসর পার্ক' বলেও ডাকছে। নির্জন সবুজদ্বীপে এরকম কাঠ খোট্রা নীরস বস্তু যে কতটা দ্বীপের আদি চরিত্র হনন করছে সেটা কারুর মাথায় এল না, এটাই আশ্চর্যের। সূর্যদেব সাতরঙা ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করেছেন পাহাড়ের পিছনে। নৌকায় ভাসতে ভাসতে শান্ত চিলিকার জলে তার প্রতিফলন দেখে মুগ্ধ হলাম। অপূর্ব প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলাম।

রাতেই পান্থনিবাসের ম্যানেজারের সাথে কথা বলে রুট ঠিক করে নিয়েছিলাম। আজ আমাদের গন্তব্য নলবন ও কালিজাই দ্বীপ। ম্যানেজারের ঠিক করে দেওয়া বোটে ভেসে পড়ি সারাদিনের জন্যে। রম্ভা থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে নলবন। বোট ভটভট আওয়াজ তুলে ঘণ্টাশিলা পাহাড়ের গা ছুঁয়ে এগিয়ে চলে উত্তর-পূর্ব কোণে। চারিদিকে থই থই জল। মাঝে মাঝে পাখিদের দলকে ভেসে বেড়াতে দেখছি কিন্তু বোটের আওয়াজে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। সে দৃশ্যও চমৎকার। অর্দ্ধবৃত্তাকারে পাখিদের ওড়ার দৃশ্য কেবল মন ক্যামেরা নয়, এমনি ক্যামেরাতেও বন্দী করা হল। এবার পাখির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে সী-গালের ওড়াউড়ি, সোনালী ডানার শঙ্খচিল, পানকৌড়ি বলে দেয় নলবন আর বেশি দূরে নেই। দূরে দেখা যাচ্ছে ওয়াচটাওয়ার। তীরে এসে তরী ডুবে যাওয়ার মতো বোট গেল কাদায় আটকে। 'হেঁইয়োরে মার জোর হে আল্লা, হে রামা' গান গাইতে গাইতে মাঝিদের সঙ্গে বোট ঠেলতে থাকি কাদায় নেমে। এত মজা হয়েছিল তা লেখার মতো কলমের জোর আমার নেই। এরপর একটা নালা পাওয়া যায়। প্রচুর জলজ উদ্ভিদের ঝোপের গা ঘেঁষে নালা ধরে বোট চলে আসে নলবনে। সবাই কাদায় কিম্ভুতকিমাকার। সেই চেহারা নিয়ে উঠে পড়ি ওয়াচ টাওয়ারে।

টাওয়ার থেকে যেদিকে তাকাই হাজারো পাখির মেলা যেন ফুল ফুটে রয়েছে। ১৫ কিলোমিটার বিস্তৃত নলবন। নলগাছ রয়েছে অল্প কিছু, জলায়

রম্ভার সৈকতে ছবি- শক্তিপদ ভট্টাচার্য

রয়েছে নানারকম জলজ উদ্ভিদ। চেনা পাখিদের মধ্যে চোখে পড়ল হাঁস, বক, সারস, কাদাখোঁচা, স্যান্ডপাইপার, লাল মাথা সাদা শরীরের ফ্লেমিংগো। অচেনা পাখিও রয়েছে অজস্র। শীতের প্রায় শেষ। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বিদেশি পাখিরা পাড়ি দেবে নিজের দেশের উদ্দেশ্যে। পড়ে থাকবে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা। বিদেশি বন্ধুদের বিদায় জানাতে নিশ্চয়ই আবাসী পাখিদের বুক ব্যথায় টনটন করে উঠবে। আবার এক বছরের প্রতীক্ষা।

অনেকটা সময় কাটিয়ে বোট আমাদের নিয়ে চলে কালিজাই দ্বীপে। দূর থেকে কালিজাই মায়ের রঙিন মন্দির চোখে পড়ে। বোট এসে ঘাটে নোঙর করে। ঘাট ছাড়িয়ে উঠতেই মন্দির। চারিদিকে নানাবিধ জিনিসের দোকান, খাবার দোকানকে পাশে রেখে মন্দিরে উঠতে হল। কালী মূর্তি, পূজাপাঠ চলছে। নাটমন্দিরের সামনে অল্প একটু জায়গা। এখানে একটি ফলকে লেখা মন্দিরের ইতিহাস থেকে জানা গেল যে, এখানকার রাজা ছিলেন ভাগীরথী সিং। হঠাৎ খবর এল শত্রুপক্ষ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। রাজা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। হঠাৎ একরাতের মধ্যে এখানে এসে জড়ো হল লাখ লাখ ফ্লেমিংগো। লাল মাথা ফ্লেমিংগোর দল দেখে শত্রুপক্ষ এদের ভাগীরথী সিং-এর বিশাল সেনাবাহিনী বলে ভুল ক'রে, ভয়ে পিছু হঠে গেল। রাজার রাজ্য বেঁচে গেল। রাজার বিশ্বাস স্বয়ং মা কালী তাদের রক্ষা করেছেন। তখন তিনি এই দ্বীপে মা-কালীর মন্দির স্থাপন করলেন। মকর সংক্রান্তিতে বড়ো পুজো হয় এবং মেলা বসে। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে।

এবার ফিরে চলি রাতের আস্তানার দিকে। পশ্চিম আকাশে শুরু হয়ে গেছে হোলি খেলা। চিলিকার জলে তার প্রতিফলন। ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে, আমরাও নেমে পড়ি রম্ভা পান্থনিবাসের জেটি ঘাটে। দু-দিনের ছুটি শেষ। এবার ফিরে যেতে হবে নিজের আবর্তে। রম্ভা আমাদের বড়ো আপন করে নিয়েছিল, দিয়েছিল গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য, পরম যত্ন, বাড়িয়ে দিয়েছিল বন্ধুত্বের হাত। আজ সে হাত ছাড়িয়ে নিতে বড়ো কষ্ট। তবে রম্ভাতে আবার আসতে হবে বাকি অদেখা জায়গাগুলো দেখার জন্য।

গৃহ ছবি

রত্না ভট্টাচার্য

ভ্রমণ পাগল, লেখালেখিতে প্রবল উৎসাহ, পশ্চিমবঙ্গ জেলা ভ্রমণ এবং উৎসব ও মেলা নিয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তকের প্রণেতা। এছাড়াও পত্র-পত্রিকায় লেখা তাঁর ভালোলাগা।

ভীমবেটকা

নীলকণ্ঠ

পিসিমাকে আবিষ্কার করি ভীমবেটকার রুক্ষ জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি পথে। ভীমবেটকার এদিকটায় পুরোটাই শ্বাপদসংকুল। ঘন জঙ্গলের বুক চিরে এবড়ো খেবড়ো খাড়াই পাহাড়ি রাস্তা, ভল্লুক, অজগর, চিতা কিংবা বানরের দেখা পাওয়াটা যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে।

পর্যটক যাঁরা– এদিকটায় বিশেষ কেউ আসেন না। এমন নির্জন গা ছমছমে পথটা ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকেও সেই নির্দেশিকাই জারি করা আছে। তবু আমার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে সে পথে পা বাড়িয়ে নজরে আসে এক অশীতিপর বৃদ্ধা একা নীচ থেকে উঠে আসছেন উপরে। অশীতিপরই বা বলি কেমন করে। ঋজু চেহারা। চোখে মুখে একটা সতেজতা। দৃপ্ত ভঙ্গী। কারও বয়স অনুমান করাটা বাতুলতা।

থমকে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধাও এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। এই পাহাড়ি পথে চড়াই ভেঙে আসতে হাঁফ ধরেছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে পাশের ছায়ায় পাথরের উপর বসালাম। বৃদ্ধার গলা থেকে কাঁপা স্বরে বেড়িয়ে এলো– 'ও গড! তুমিও এ পথে?'

ভূপাল থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূবে রাইসেন অঞ্চলে ভীমবেটকা। স্থানীয় আদিবাসীরা বলে ভীমবইঠিকা। কথিত অরণ্যবাসকালে ভীম এসে এখানে একসময় বসেছিলেন। তাই ভীমবইঠিকা। সে কল্পশ্রুতি।

কিছুদিন আগেও জায়গাটা তেমন জানা ছিল না কারও। বিন্ধ্য পর্বতমালার এ অঞ্চলে এমন একটি পৃথিবীর বিস্ময়কর স্থান আছে কেউ ভাবতে পারেনি। প্রায় পাঁচশোর উপর প্রাকৃতিক পাহাড়ি গুহা ছড়িয়ে রয়েছে বিন্ধ্য আর সাতপুরা পাহাড়ের

ভীমবেটকা গুহাচিত্র

ছবি- সৌজন্য মধ্যপ্রদেশ টুরিজম ওয়েবসাইট

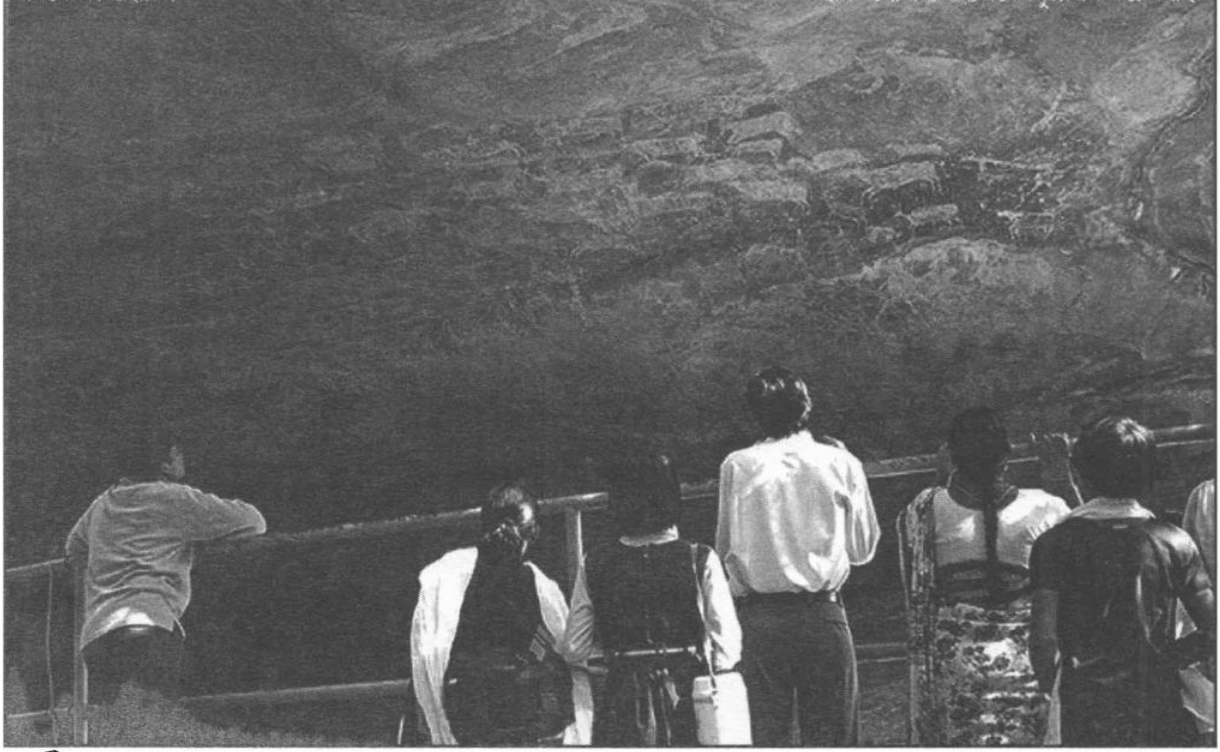

ঢালে ঢালে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শুরু করে সাতপুরার উত্তর দিকে বিস্তৃত এই গুহা। পুরাতত্ত্ববিদদের মতে গুহাগুলো প্রায় এক লক্ষ বছর আগেকার। অদ্ভুত প্রাকৃতিক গুহা।

বিস্ময়ের এখানেই শেষ নেই। এই গুহাগুলোর ভেতরের দেয়ালে রং-বেরঙের ছবি আঁকা রয়েছে। ঠিক যেমনটা আমরা দেখতে পাই অজন্তার গুহা চিত্রে। প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার।

আর এখানেই একটা বড়ো ভুল ছিল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের। অজন্তা গুহাচিত্রের সমসাময়িক ভেবে তাঁরা এটাকে বুদ্ধের সময় কালের চিত্রকলা হিসেবে নথিবদ্ধ করে ছিল। সে ভুলটা ভাঙল ১৯৫৭ সালে এসে।

ভি.এস.ওয়াকানকার নামে এক বিদেশি ভদ্রলোক একদিন ট্রেনে করে বিন্ধ্যপর্বতের পাশ দিয়ে ভুপালের দিকে যাচ্ছিলেন। সে সময় তাঁর নজরে আসে এই পাহাড়ের গঠন যেন অনেকটাই তাঁর দেখা স্পেন এবং ফ্রান্সের পাহাড়ের গঠনের মতো। কৌতূহলে তিনি একদল পুরাতত্ত্ববিদকে সাথে নিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন ওই অঞ্চলে এবং নতুন করে আবিষ্কার করলেন এই গুহাগুলোকে। চলল গভীর অনুসন্ধান– গবেষণা। আর তাতেই প্রমাণিত হল আনুমানিক এক লক্ষ বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রাকৃতিক গুহাগুলো।

বিবর্তনের ফলে প্রস্তর যুগের মানুষ যখন গুহার মধ্যে তাদের বাসস্থান নির্ধারণ করতে শুরু করল, সে সময় এই গুহাগুলো হয়ে উঠেছিল তাদের আশ্রয়স্থল। সেও প্রায় তিরিশ হাজার বছর আগেকার কথা। এই গুহাগুলোতে বসবাস করার সময় সেই আদিম মানুষদের হাতের ছোঁয়ায় এর দেয়ালগুলো বিভিন্ন ছবিতে ভরে উঠেছে।

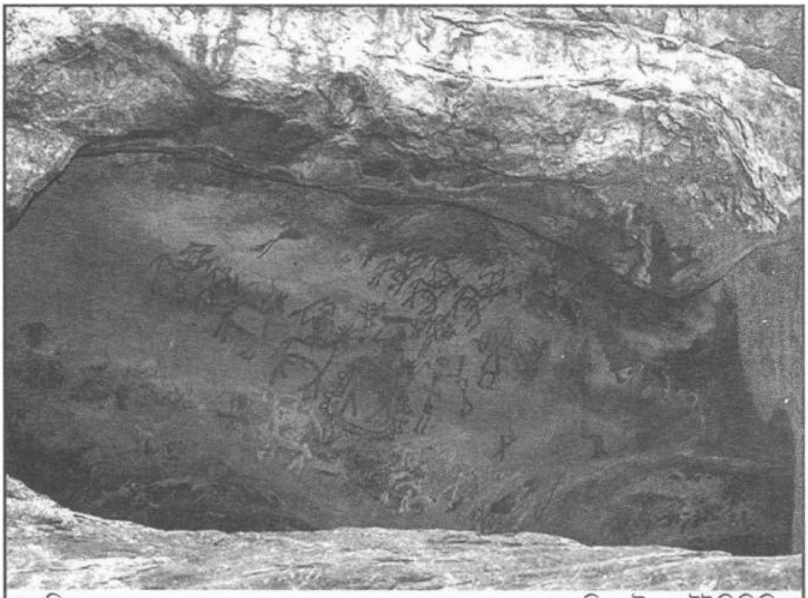

গুহাচিত্র ছবি- সৌজন্য উইকিপিডিয়া

ছবিগুলো যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই রঙিন। লাল-সাদা-সবুজ-হলুদ এমনই প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার রয়েছে ছবিগুলোতে। এতো বছর পরেও যা অমলিন। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিস্ময়কর সৃষ্টি। কোনও গুহায় আঁকা বাইসন, বাঘ, গণ্ডার, বিভিন্ন পশুপাখির ছবি। বিবর্তনের ফলে যে সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ তারও সুন্দর রূপ পেয়েছে অন্য গুহা চিত্রে।

দল বেঁধে শিকারে যাওয়া– বর্শা, তীর-ধনুকের মতো অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, মৃত শিকারকে বয়ে নিয়ে যাওয়া, মা এবং শিশু কিংবা গর্ভবতী স্ত্রীলোক এসব দৈনন্দিন জিনিস বা চরিত্রের ছবি ফুটে উঠেছে গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে।

এরপরই সৃষ্টি হয়েছে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ছবি- সমবেত নাচ। আর এই নাচের মুদ্রাগুলো যেন আধুনিক নাচেরই বিস্ময়কর প্রতিফলন।

২০০৩ সালে UNESCO গুহাগুলোকে 'ওয়ার্লড হেরিটেজ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। মোট পাঁচশো গুহার মধ্যে পর্যটকদের জন্য গোটা ত্রিশেক গুহা দেখার ছাড়পত্র আছে।

গভীর শ্বাপদসংকুল জঙ্গলের মধ্যে সে সব গুহা ঘুরে দেখাও সম্ভব নয়। অনেকেই কয়েকটি গুহা দেখে ফিরে যান কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে। কখন বাঘের মুখে পড়বেন– কিংবা ভাল্লুক– কিংবা বানর! একটু বেপথে এসে একা এই বৃদ্ধা পিসিমাকে এখানে দেখে তাই চমকে উঠেছিলাম। এক গুহার শান্ত ছায়ায় বসে জেনেছিলাম অনেক কথা। এক সময়ের নাম করা কনভেন্ট স্কুলের শিক্ষিকা জীবনের শেষ বেলায় এসে এই রুক্ষ প্রস্তর গুহায় জীবনের ছবি দেখেছেন। যে ছবি জীবন্ত– অমলিন। কালের টানে এক সময় সবই হারিয়ে যায়। শুধু এই গুহাচিত্রের মতো কিছু উজ্জ্বল ছবি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে উত্তরপুরুষকে জানান দিতে যে আমরাও এককালে ছিলাম।

নীলকণ্ঠ

চাকুরিজীবী, নেশা ভ্রমণ, বেড়ানোর লেখালেখিতে অভিজ্ঞতা বিনিময়।

অযোধ্যা পাহাড়ের প্রথম স্মৃতি

জগৎপতি ঘোষ

অনটন ও দারিদ্র্যের শিকারে জর্জরিত শৈশব, কৈশোর যখন মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয়, তখন আমার মধ্যে শুধু একটি জিনিসকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলাম, তাহল প্রকৃতির কোলে তাকে খুঁজে নেওয়া। আর্থিক সাবলম্বী হওয়ার পরে অনেক ঘুরেছি বা এখনও ঘুরছি, তবু জীবনে প্রথম গণ্ডী ছাড়ানোর স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে আছে। অনেক স্থানে তিন বা চারবার গিয়েছি, কিন্তু প্রথম দেখার স্বাদ আর খুঁজে পাইনি।

কলেজে তখন প্রথমবর্ষের ছাত্র আমি, প্রাইভেট টিউশনি করে খরচ চলছে, পাহাড় কল্পনায় আছে, বাস্তবে দেখিনি। কাছাকাছি পাহাড় মানে পুরুলিয়া, তাই একদিন দুই বন্ধু মিলে পকেটে ত্রিশ টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা। বর্দ্ধমান থেকে জম্মু-তাওয়াই ধরে আসানসোল, অবশ্যই বিনা টিকিটে। তারপর সেখান থেকে বিকাল সাড়ে চারটেয় উঠে বসলাম আসানসোল-টাটা প্যাসেঞ্জারে। যতদূর মনে হয় মার্চ মাস, বেলা বেশ বড়ো। বিনা টিকিটের ভ্রমণ, পকেটে স্বল্প রসদ, অজানা পথ, শরীর উত্তেজনায় কম্পমান। বার বার উঁকি ঝুঁকি মারছি এই বুঝি টিকিট চেকার এল।

দামোদর নদী পার হওয়ার পর আসানসোল-বার্ণপুরের শিল্পাঞ্চল চোখের আড়ালে চলে গেল। চোখের সামনে এল পুরুলিয়ার লাল মাটির রাস্তা, ছোটো ছোটো গ্রাম। ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে কিছু জঙ্গল। গ্রামাঞ্চলের লাল রাস্তার পাশে ছোট্ট কুটির মনে ডেকে আনে একতারার সুর। জানালা দিয়ে গোগ্রাসে সব গিলতে থাকি। আমার সেই চেনা গ্রাম ও সমতল মাঠ ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছি এক অন্য স্বাদের জগতে। বাড়ির পাশের DVC খাল দেখে অভ্যস্ত, তাই হঠাৎ যখন ঢেউ খেলানো মাঠের মাঝদিয়ে ছোটো নদী এঁকেবেঁকে চলেছে, মন তখন উদাস হয়ে ভাবে এর কোথায় শুরু কোথায় শেষ কে জানে?

ট্রেন যখন রামকানালী স্টেশন-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছে তখন সুবিশাল পাঞ্চেত পাহাড় গুরুগম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, একেই তাহলে পাহাড় বলে! সারা শরীর সবুজ চাদরে মোড়া, কিন্তু ওই গাছগুলো কত বড়ো হতে পারে সে সম্বন্ধে ধারনা ছিল না, দূর থেকে মনে হচ্ছিল ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা। এরপর একস্থানে একটা বড়ো খেলার মাঠে দেখি প্রচুর লোকের ভিড়। সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওখানে মোরগ-লড়াই চলছে। মোরগ-লড়াই-এর এত জাঁকজমক জানতাম না। গোধূলি লগ্নে গাড়ি দাঁড়ায় জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে। গোধূলি রশ্মিতে লাল পশ্চিমাকাশের নিচে তিনটি চূড়া দাঁড়িয়ে রেলস্টেশনের খুব কাছে। দেখে মনে হয় মহানৈবেদ্যর থালায় আলো চাল দিয়ে চূড়া করে মাথায় একটি নাড়ু বসানো। পাঞ্চেত পাহাড়ের থেকেও একে দেখে মন যেন বেশি হিল্লোলিত হতে থাকে। মনে হয় গাড়ি থেকে ছুটে গিয়ে কোনও এক চূড়ার মাথায় উঠে বসে বলি যাকে দেখার বাসনায় এসেছি, তাকে আমি জয় করেছি, এর মধ্যে বামদিকে শেষ চূড়াটি বড়ো আর্কষণীয়, বরণডালার 'শ্রী'-র মতো চূড়ার দিকের ঢাল মসৃণ কালো এবং খাড়া।

তখন জানতাম না এর দশমাস পর এই পাহাড়েই আমরা পর্বতারোহণ শিক্ষার কোর্স করব এবং এই ঢাল ধরে উপরে উঠে আবার 'মরণলাফ' দেব। সেদিন চূড়ায় উঠে কিন্তু ট্রেনের ভেতর থেকে এই চূড়াকে দেখার মতো আনন্দ খুঁজে পাইনি, শুধু মনে হয়েছে যে স্বপ্নটা সফল হল। এরপর ২০১৪ সালে এসে জয়চণ্ডী পাহাড়কে দেখলাম এক প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত আমার পর্বতারোহণের শিক্ষার সময় যা ছিল তাও নেই। বনভূমি শেষ, জয়চণ্ডী চূড়ায় নতুন মন্দির হয়েছে, নতুন সিমেন্টের সিঁড়ির রাস্তা। পিকনিক পার্টির দৌরাত্ম্য, মানুষের ঢল এবং ডিসেম্বরে জয়চণ্ডী উৎসব প্রকৃতির জয়চণ্ডীকে শ্মশান যাত্রায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আঁধার ঘনিয়ে আসে পরের স্টেশন আদ্রা জংশনে। আমরা এখানে নামলাম। ছোটো রেলশহর। আজকের আদ্রার ভিতর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাতের ভরসা এক বন্ধুর বাড়ি, সে আমাদের সাথে পড়ত এবং হোস্টেলে থাকত। আমরা আসছি সে কিন্তু জানে না। তখন মোবাইল যুগ কল্পনায় আসেনি, শুধু পোস্টকার্ড ও ইনল্যান্ড চিঠির যুগ চলছে। বন্ধুর মুখে শোনা ছোটো গির্জা ও L/13D নম্বর কোয়ার্টার। রেল শহর বলে সব ধর্মের ও রাজ্যের লোক আছে। প্রায় সারা শহর পায়ে হেঁটে ঘুরে শেষে বন্ধুর কোয়ার্টারের কাছে এলাম। ও আমাদের দেখে ভূত দেখার মতো চমকে

উঠল, বলল তোরা এলি কী করে? যাই হোক বন্ধুরা তিনভাই ও এক বোন এবং বিধবা মা এই নিয়ে সংসার, বড়দা বাবার দেহান্তের পর রেলে চাকরিটা পেয়েছে। মা বড়ো ভালো মানুষ। আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন। চারদিন ছিলাম এখানে। কোয়ার্টারের আউটহাউসে থাকতাম।

বড়ো সুন্দর ছোট্ট এই রেলশহর। শহরের শেষ সীমানায় বন্ধুর কোয়ার্টার, তারপর একটি কবরখানা; এরপরেই ধূ ধূ মাঠ ও পশ্চিমে নীল আকাশ। সামনে গির্জা। দোতলার ব্যালকনিতে বসে আমি সারাদিনের খেলা দেখতাম। রবিবার দলে দলে লোক চার্চে যেত। দুপুরের নির্জনতায় পাখীর ডাক শুনতাম। সবথেকে ভালো লাগত ভোর বেলার গির্জার মধুর ঘন্টা-ধ্বনি। এত বছর পরেও সেই ঘন্টাধ্বনি আমার স্মৃতিতে গেঁথে আছে। এরপরে আরও বারচারেক বন্ধুর বাড়ি এসেছি, কিন্তু আজ তারা হারিয়ে গেছে। পরে খোঁজ করেও তাদের আর সন্ধান পাইনি। শুধু প্রথম সীমানা হারানোর স্মৃতিতে তারা আজও আমার হৃদয়ে দীপ্যমান।

এবার মন টানছে অযোধ্যা পাহাড়। কিন্তু বন্ধু বিশ্বজিৎ হাজরা বার বার আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করে। তখন অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছিল। সে বলে, দেখ আমি পুরুলিয়া জেলার ছেলে, কিন্তু পুরুলিয়া শহরের পর আর যাইনি। কোথায় যাবি, কোথায় থাকবি কী হবে— এইসব চিন্তায় সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু জীবনে প্রথম অচেনাকে চেনার আনন্দে আমরা মশগুল। শেষে দুপুরে এক ট্রেনে তুলে দিয়ে বলে, সাবধানে যাবি, সম্ভব হলে ফেরার সময় আসবি। ট্রেনের নাম মনে নেই, তবে বিনা টিকিটের যাত্রী বলে দুপুর বেছে নিয়েছিলাম। এত বছর পরেও স্মৃতির ঘরে আবছা হয়ে যাওয়া স্টেশনের ছবিগুলো টুকরো টুকরো মনে আছে। গড়ধ্রুবেশ্বর, আনাড়া, কুস্তাউর, ছড়রা তারপর পুরুলিয়া, মাঠের ঢেউ খেলানো রূপ আরও বড়ো হয়েছে। দূরে দূরে একটা দুটো করে টিলা, ছোটো ছোটো গ্রাম, পুকুর ভর্তি নতুন শালুক-পদ্ম গাছ ও বসন্তের নবজোয়ারে প্লাবিত সরু সরু বাঁশের ঝাড় আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফসলহীন ফাঁকা মাঠে মাঝে মাঝে একটা দুটো শিমূল বা পলাশ লাল ফুলের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বিকালের পড়ন্ত রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে বাসন্তী আগমনীর গান গায়। সেই রূপ যে মনে আজও অম্লান হয়ে আছে।

পুরুলিয়া স্টেশনে গাড়ি ঢোকে, টিকিট চেকার-এর জন্য সাবধান হই। তখন পুরুলিয়া এখনকার মতো বড়ো স্টেশন নয়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি একটি ছোট্ট স্টিম ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে। পিছনে চারটি ছোটো বগি। বড়ো স্টিম ইঞ্জিন দেখেছি, এত ছোটো ইঞ্জিন দেখিনি বা সরু রেলপথের (ন্যারো গেজের) ধারনা আমার ছিল না। এটা ছিল একটা বড়ো প্রাপ্তি। একটা সরু রেলপথ গ্রাম গ্রামান্তর হয়ে ছোট্ট কটি বগি নিয়ে ছুটে চলবে সেটাই তখন মানসপটে ভেসে উঠল। বন্ধুকে বলি, একদিন এই গাড়ি চাপতে হবে। কিন্তু না, সেই গাড়ি চাপা হল না। যখন সময় হল তখন ওই ছোটো রেল উঠে গিয়ে কোটশিলা-পুরুলিয়া ব্রডগেজ হয়ে গেছে। তবে সেই স্বপ্ন আমোদপুর-কাটোয়া ন্যারোগেজে পূরণ করেছিলাম, সে এক অন্য গল্প। পুরুলিয়া ছাড়তেই মন খুশিতে ভরে গেল। আর চেকারের ভয় নেই।। একটা স্টেশন নতুন তৈরী হচ্ছিল, নাম যত দূর সম্ভব টামনা। লাইনের ধারে ফুলে সজ্জিত পলাশ, পিটুলি গাছ বাড়তে লাগল, পরের স্টেশন কাঁটাডি। দূর পশ্চিম দিগন্তে প্রথমে কালো রেখা, পরে অযোধ্যা পাহাড়ের রেঞ্জ দৃশ্যমান হতে শুরু করল। একটি নদী সেই পাহাড় থেকে নেমে বিশাল চওড়া হয়ে বয়ে চলেছে। অগভীর কিন্তু বালির চড়ার মাঝে মাঝে সরু সরু জলের ধারা। গ্রাম চোখে পড়ে না, কিন্তু চাষের জমি গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে। ফাল্গুনী হাওয়ায় জলে শত সহস্র ছোটো ছোটো ঢেউয়ের মাথায় রোদ মুক্তোর নাচন তোলে। সেদিন কিশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমি চেয়েছিলাম ওই নদীর খাত ধরে পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতে। তাহলে বোধহয় ওই ভ্রমণের সব আনন্দের সমাপ্তি ঘটে যেত।

সন্ধ্যায় নামলাম জনমানবহীন এক স্টেশনে, নাম বরাভূম। স্টেশনের বাইরে দোকান দু'একটা। শহরের নাম বলরামপুর। ছোট্ট কোলাহলহীন শহর। রাস্তার ধারে দু'চারটে দোকানপাট। লোকসংখ্যা শহরে খুব কম। দোকানে জিজ্ঞেস করে আধো অন্ধকারে এগিয়ে রাস্তার ধারে এক বিশাল চৌবন্দি সাদা বাড়ির সামনে এলাম। শরাফ ধর্মশালা। ঘরভাড়া দু'টাকা। ঘরে শুধু একটা কাঠের চৌকি। পুরুলিয়ার মুড়ি তেলেভাজার খুব প্রভাব। রাতে তাই খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চৌকিতে লক্ষ কোটি ছারপোকা। শেষে মেঝেয় আমাদের শয্যা পাতলাম। শয্যা মানে শতরঞ্জি, আর বালিশ হল গামছা।

দু'দিন ছিলাম এই ধর্মশালায়। লোকজনহীন এই ধর্মশালা খুব নিস্তব্ধ। পিছনে একটা বড়ো ইঁদারা ছিল। ওইখানে কেউ কেউ পানীয় জল নিতে আসত। পাশের পেয়ারা গাছের ফল দিয়ে প্রাতরাশ সারতাম, দুপুর নির্জনে মেঝেয় শুয়ে ভবিষ্যতের অলীক স্বপ্ন দেখতাম। আজও সেই ধর্মশালা আছে, সঙ্গে বলরামপুর। কিন্তু তাকে এখন চেনা যায় না, সে এখন ব্যস্ত শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

সকালে বেরোলাম অযোধ্যা রেঞ্জের দক্ষিণের শেষ পাহাড়টি দেখতে। প্রায় ছ'সাত কিলোমিটার হেঁটে কাছে

পৌঁছলাম। দূর থেকে যেগুলোকে ঝোপ মনে হচ্ছিল সেগুলো বড়ো বড়ো গাছ। খানিকক্ষণ শিশুর মতো লাফিয়ে পাথর থেকে পাথরে ঘুরলাম। তারপর কাছেই একটা পুকুরে স্নান করলাম। এখানেই জীবনে প্রথম দেখলাম একটা আদিবাসী লোক স্নান করে ভিজে কাপড়ের অর্ধেক পরনে, বাকি অর্ধেক রোদে মেলা। তখনও পর্যন্ত শৈশবে পিতৃহীন আমার দারিদ্র্যকেই সব থেকে বড়ো কষ্ট ভাবতাম, সেদিন আমার চোখ খুলে গেল।

এরপর অনেকবার অযোধ্যা পাহাড় গিয়েছি, কিন্তু শেষ পাহাড় দুটো দূর থেকে দেখেছি মানবসভ্যতার চাপেই হোক বা দরিদ্র জনতার জ্বালানি যোগাতে, তারা আজ সেই সবুজ আবরণ ছেড়ে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে মাত্র তিনটি দশক-এর ব্যবধান, মনে বড়ো কষ্ট হয়। অযোধ্যা পাহাড়ের কত পরিবর্তন মানুষ ঘটিয়েছে। ডিনামাইট দিয়ে বুক ফাটিয়ে লেক তৈরী করে চলছে মানুষের জয়যাত্রা। তখন বেলা দশটায় একটি মাত্র বাস বাঘমুণ্ডি যেত। তাতে বাদুরঝোলা যাত্রী এবং দু'চারটে ছাগলও থাকত। কোনও-রকমে এসে অযোধ্যা মোড়ে নামলাম। একটি ছাড়া কোনও দোকান পাট নেই। সব ফাঁকা ধূ ধূ করছে। মার্চেই বেশ গরম। দোকানে বোঁদে লুচি খেয়ে সামনে লাল রাস্তা ধরে এগোলাম। পাহাড়ে শিমূল পলাশে আগুন ধরে লাল হয়ে ঢেকে আছে। প্রায় ১৪ কিলোমিটার হাঁটা পথ। পাকদণ্ডি ভাঙলে রাস্তা কম। বয়স কম, মনে উৎসাহ, তাই দু'জন আদিবাসীর সাথে গল্প করতে করতে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম।

পাহাড়ের মাথা এতবড়ো হতে পারে ধারণাই ছিল না। মনের কোণে লুকিয়ে ছিল উঁচু পাহাড়, মাথা হবে একটা ঘরের মেঝের সমান। যাইহোক বিশাল ছড়ানো ভূমি, মায় চাষের জমিও রয়েছে। মাথার পশ্চিম প্রান্ত থেকে পুবদিকে যেতে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা। পাহাড়ের মাথা ধাপে ধাপে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু। আর ঢালু অংশেই রয়েছে সীতাকুণ্ড। মাটির ফাটল দিয়ে একটা কুণ্ডে আপনিই জল উঠছে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস চোদ্দো বছরের বনবাসে রামচন্দ্র এখানে এসে কিছুদিন ছিলেন।

আদিবাসীরা আমাদের একটা বাংলোর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা সাজানো গোছানো বাংলোর ভিতর ঢুকলাম। কেউ নেই। উঠানে একটা মাচায় আঙুর গাছ ভর্তি। কিন্তু এ বাংলো আমাদের মতো অভাগাদের জন্য নয়। এ বাংলো কেবলমাত্র মন্ত্রী আমলাদের জন্য সংরক্ষিত। বাংলোর পিছনে বনবিভাগের বিট অফিস। আমাদের ত্রিশ টাকার দুঃসাহসিক অভিযান ও ছাত্র দেখে বিট অফিসার তাপস ঘোষ (নাম এখনও মনে আছে। বাড়ি কোচবিহার) দয়াপরবশ হয়ে বললেন, তোমরা সব ঘুরে খেয়ে দেয়ে রাতে চলে এস, থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মনের আনন্দে চারিদিক ঘুরে বেড়ালাম। সীতাকুণ্ড থেকে শুরু করে ফুটবল খেলা পর্যন্ত দেখলাম। তখন ভারত সেবাশ্রম ছিল কিনা মনে নেই, তবে সরকারি ট্যুরিস্ট লজ ছিল। বর্তমানের CADC ট্যুরিস্ট লজ গড়ে ওঠেনি। পর্যটকদের ভিড় ছিল না। সবই ফাঁকা ফাঁকা, এক সুন্দর প্রকৃতি। পূর্ব প্রান্তের একটি রাস্তার পাশে একমাত্র খাবার দোকান। রাস্তা পাহাড়ের পূর্ব গাত্র ধরে সিরকাবাদ হয়ে পুরুলিয়া গেছে। সারাদিনে একটা বাস যায় এবং আসে। খাবার দোকানে চা, মুড়ি, ঘুগনি থেকে মিষ্টি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তবে খাঁটি ক্ষীরের পেঁড়া অসম্ভব ভালো। দোকানের ভিতর মাটির তৈরী উচ্চাসন এবং একটি সমোচ্চ কাঠের উনান দাউ দাউ করে জ্বলছে। জীর্ণ শোকেসে মিষ্টান্ন সাজানো। একজন কৃষ্ণবর্ণ পোক্ত শরীর প্রৌঢ় ততোধিক কালো কড়াইয়ে পেঁড়ার জন্য দুধ মেড়ে ক্ষীর তৈরীতে ব্যস্ত। তার মাঝবয়সী পুত্র খদ্দের সামলাচ্ছে এবং প্রৌঢ়ের নাতি উনানে কাঠও দিচ্ছে এবং এঁটো বাসনপত্র ধুয়ে তুলছে। একটি দোকানে তিন প্রজন্ম। আমরা ঘুগনি, মুড়ি ও পেঁড়া খেয়ে রাত আটটায় এলাম বিট অফিসে। অবিবাহিত তাপসবাবুর ঘরের মেঝেয় সুখ নিদ্রা দিয়ে পরদিন ফেরার রাস্তা ধরলাম।

আমার ভ্রমণ এখানেই শেষ। পাহাড় দেখার সাধ মিটল, স্থানাভাবে অনেক কথা লিখতে পারলাম না। এরপর তিনবার 'Rock climbing course'-এর জন্য ক্লাবের হয়ে মাঠা পাহাড়ে দশদিন করে তাঁবু খাটিয়ে থেকে গিয়েছি, ছৌ নাচের গ্রাম চরিদা গিয়েছি, কিন্তু কাছেই অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় আর ওঠা হয়নি।

প্রায় ত্রিশ বছর পর টাটা সুমো করে চাঁদিপুর থেকে ফেরার পথে চাণ্ডিল-বলরামপুর হয়ে অযোধ্যার মাথায় হাজির হই। সব পাল্টে গেছে, —বলরামপুর, অযোধ্যা পাহাড়, মাঠা পাহাড়। সেই সুখস্মৃতির আলোয় সব কিছু মেলাতে গিয়ে মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। পাহাড়ের পশ্চিম দিয়ে উঠে পূর্বে সিরকাবাদ হয়ে এখনই চলে যাব। সেই দোকানে কিছু শুধু খেয়ে নেব। এখন আরও দোকান হয়েছে, মানুষজনের ভীড় বেড়েছে। বিষণ্নতার মাঝে চমকে উঠি। সেই দোকান এখনও একরকম আছে। সেই একই তিনটে মানুষ। শুধু অতীতের মাঝবয়সী এখন প্রৌঢ়ের স্থানে খুন্তি নাড়ছে। নাতি এখন মাঝবয়সী হয়ে বেচাকেনা করছে আর নতুন প্রজন্ম উনানে কাঠ ঠেলছে। বুক আনন্দে ভরে ওঠে। এখনও তাহলে সব পাল্টায়নি, একটা জায়গা ঠিক আছে। তিন প্রজন্মের ট্র্যাডিশন, জানি না কতদিন থাকবে।

জগৎপতি ঘোষ

চাকুরিজীবী। নেশা, বেড়ানো, ট্রেকিং আর ছবি তোলা, সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা।

ছবির পাতা

'প্রকৃতির ভাস্কর্য', গনগনি, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ছবি- তরুণ রায়

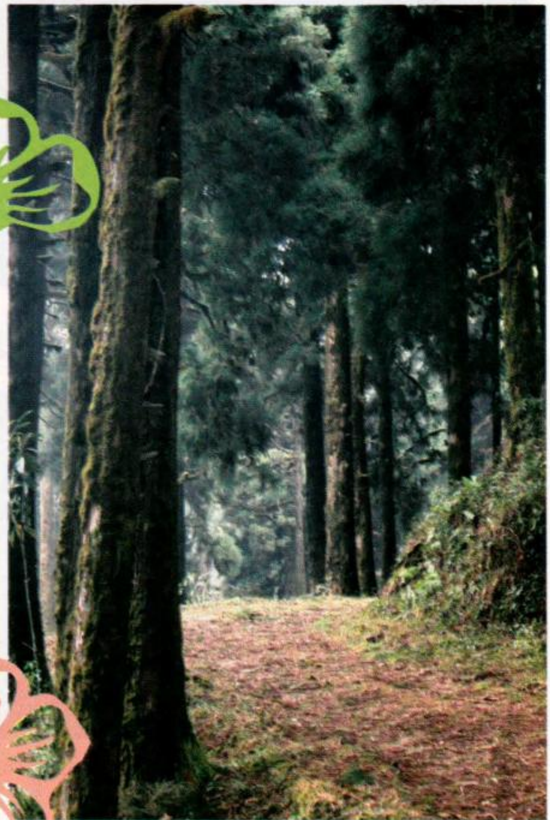

'নির্জনে', চটকপুর ছবি- পার্থ বসু

'বিশ্বাস', কুম্ভমেলা-২০১৩ ছবি- তরুণ রায়

'তুষার শুভ্রতা', টেনডং, সিকিম ছবি- দিলীপকুমার মিত্র

'অভিযানের পথে', বাসুকিতাল, গাড়োয়াল, উত্তরাখণ্ড ছবি- গুরুদাস বিশ্বাস

'শান্তনীড়', চটকপুর ছবি- শ্যামাপ্রসাদ সাঁই

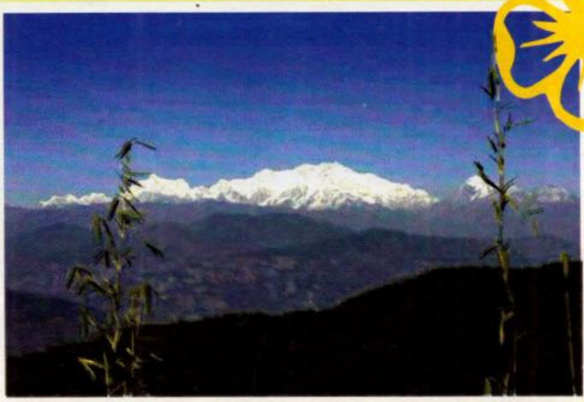

'শায়িত বুদ্ধ', ধোত্রে ছবি- প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য

া পাতা

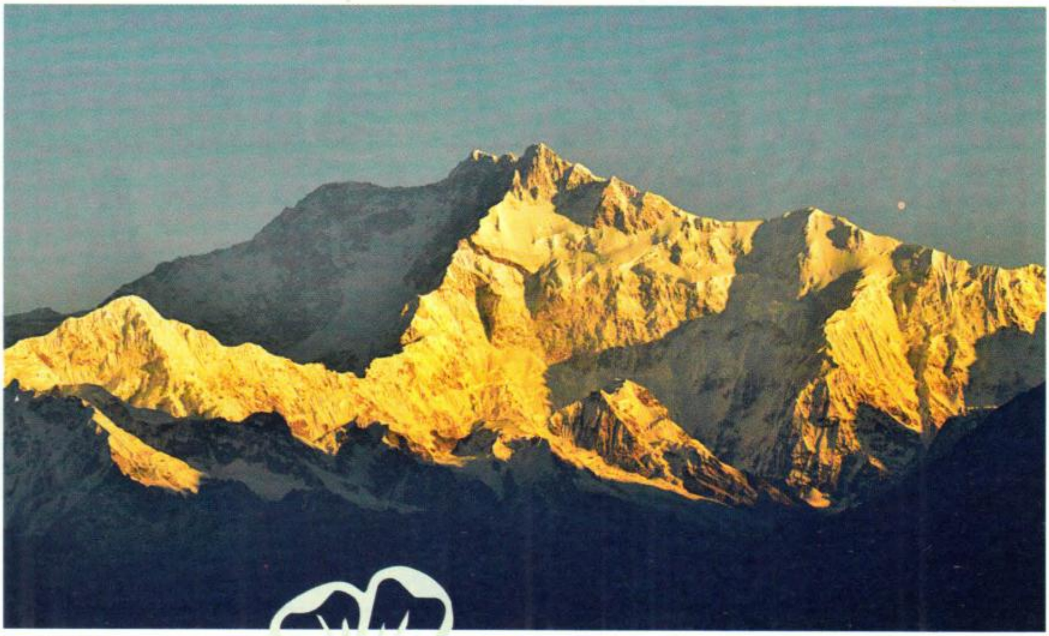

'কাঞ্চনজঙ্ঘা', চটকপুর থেকে ছবি- শ্যামাপ্রসাদ সাঁই

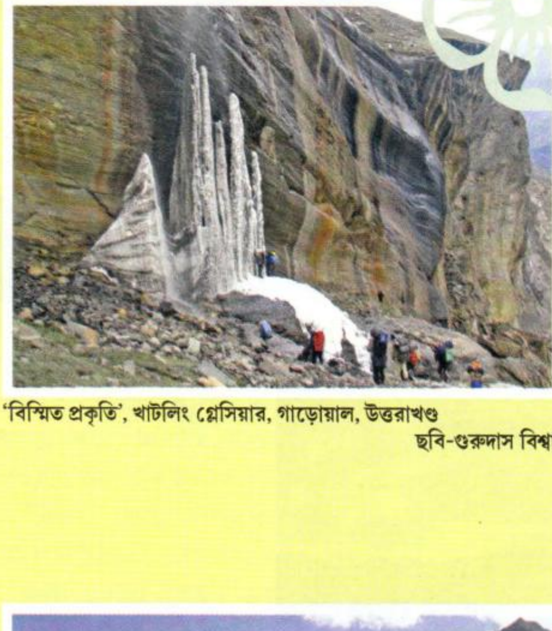

'বিস্মিত প্রকৃতি', খাটলিং গ্লেসিয়ার, গাড়োয়াল, উত্তরাখণ্ড
ছবি-গুরুদাস বিশ্বাস

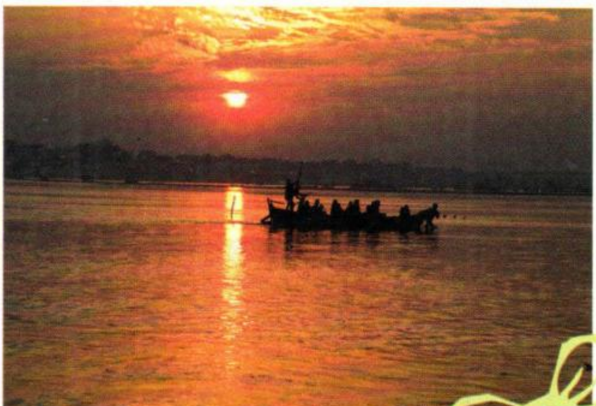

'অস্তরাগে', প্রয়াগ, এলাহাবাদ ছবি-হরিসাধন দে অধিকারী

'বিস্মিত সৌন্দর্য', ছিটকুল, হিমাচল প্রদেশ ছবি-উৎপল দাস

'উচ্ছ্বাস', আদিবাসী ছাতা উৎসব, গাজোল, মালদা ছবি- দিলীপকুমার মিত্র

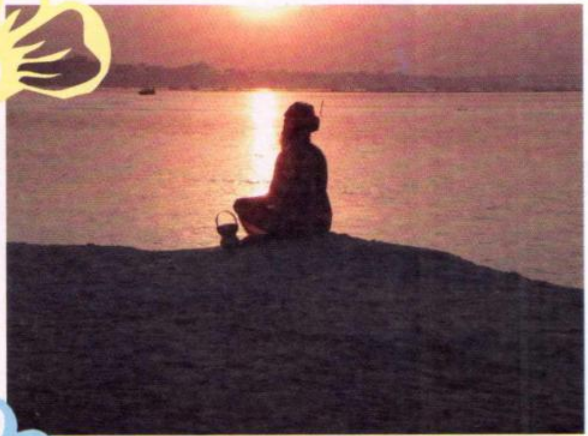

'ধ্যানমৌনি', কুম্ভমেলা-২০১৩ ছবি- হরিসাধন দে অধিকারী

'হর কি দুন' ছবি- ডাঃ আশীষ রায়

'উদ্ধত রডোডেনড্রন', ভার্সে ছবি- দেবনারায়ণ মাঝি

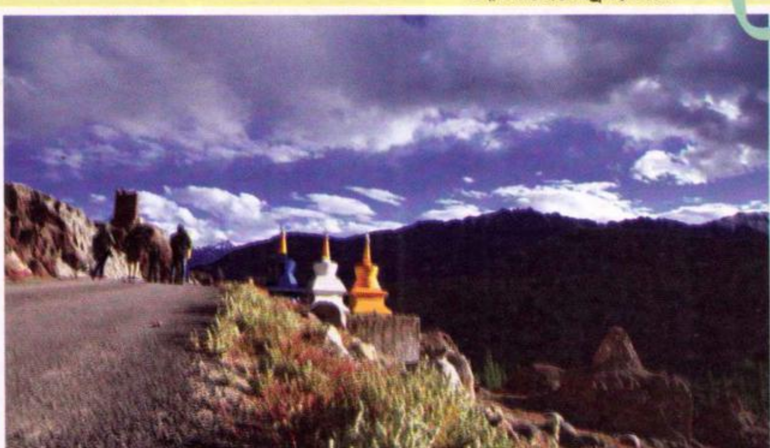

'বাসগো মনাস্ট্রি', লেহ ছবি- ডাঃ আশীষ রায়

বোলান

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

বৃহস্পতির মাঝরাতে আকাশ যেন সতীনাথ। সতীবিহনে তিনি যেমন তাণ্ডব নেচেছিলেন, ঠিক তেমনি নাচন জুড়েছে আজ রাতদুপুরে কালবোশেখী। ভাগের বখরা নিয়ে দু-পাড়ার দাদাদের মধ্যে পেটো চলার মতো দুমদাম বাজ পড়া, ঘনঘন ছুরির ঝলসানি আর অঝোর বৃষ্টিধারা। রাতটা ৩ মে ২০১২।

আগের রাতে রিক্‌শ বলে রেখেছি, সাতসকালে ট্রেন। অন্ধকার থাকতেই গুছিয়ে নিয়েছি কিন্তু সকাল আর হয় না। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমার বিপদতারণকে ডাকতে গিয়ে দেখি সে কালান্তক গরমের কয়েদ থেকে এমন রাতভোর বৃষ্টির প্যারোলে মুক্তি পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বউ-বাচ্চা নিয়ে।

দুবার ডাকতেই দিলীপ 'আসছি' বলে সাড়া দিল। তারপর আমি আর আমার গিন্নি হুড তুলে, ছাতা আড়াল করে ক্যামেরা, কস্টিউম আর কড়ি সামলে ভিজতে ভিজতে চললাম আর ছেলেটি মাথায়-পিঠে প্লাস্টিক জড়িয়ে উল্টো হাওয়ায় গাড়ি টানতে লাগল।

টিকিট কেটে হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনে উঠতেই দেখি ব্যাণ্ডেল লোকাল দু-কদম এগিয়ে গেছে। যাক, কাটোয়া তাহলে হাতছাড়া হয়নি। সকালবেলা ততক্ষণে ভিজেবেড়াল, যেন রাতের কথা কিচ্ছু জানে না।

চন্দননগর থেকে আশাদি উঠবেন। প্রায় দেড়বছর ধরে আমায় আশা দিয়ে এসেছেন যে উনি আমায় নিয়ে যাবেন ওনার গ্রামের বাড়িতে বোলান দেখতে। এক জায়গায় আমরা এখন চারজন, সকালের জলখাবার হয়ে গেল একপ্রস্থ, এটা দাদার সৌজন্যে। দিদির দুই মেয়ে কখন যেন খাবার তৈরী করে ব্যাগে ভরে দিয়েছে।

পরপর পেরিয়ে যাচ্ছি স্টেশনগুলো। ত্রিবেণী, জিরাট, বলাগড়, অম্বিকা-কালনা। গুপ্তিপাড়ার রথ বহু প্রাচীন, এখানে সিরাজ-সেনাপতি মোহনলাল আর তার বোন শিবানীর জন্মস্থান। বাগনাপাড়ায় ক-দিন আগেই এসেছিলাম, এখানে নীল আর চড়কের দিন সেরা সঙ সাজার দিন।

কামরায় আমাদেরই সহযাত্রী কয়েকজন নদিয়ার সোনপলাশীর বাসিন্দা, কেউ ছোটো মুদি, কেউ চাষীমানুষ, কেউবা মাছবিক্রেতা। আজ এরা সবাই এক গোত্রভুক্ত, সবাই সন্ন্যাসী। পরনে রক্তাম্বর, গলায় ছোট্, চলেছে ধর্মরাজের গাজনে। কাছেই জামালপুর, এখানকার বুড়োরাজের গাজন বিখ্যাত।

কাটোয়া পৌঁছাতে প্রায় ১১.৩০ হয়ে গেল। যাব সালার, সেখান থেকে কান্দি। টিকিট কেটে এখন অপেক্ষা। একটা গাড়ি ঢুকল, ও সালার যাবে তবে বেলা একটায়, অগত্যা লটবহর নামিয়ে বসে থাকা। কাটোয়া-আমোদপুরের ছোটো গাড়িটা দু-কামরার বাক্স টেনে ঢুকল, খানিকবাদে ছাগল- ঝুড়ি-আনাজ-কচিকাঁচা-লোকলস্কর নিয়ে বাগান-উঠোন পেরিয়ে দম ছেড়ে ছেড়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে চলেও গেল।

১টার গাড়ি ছাড়ার আগেই আরেকটা গাড়ি এসে গেল, এটার বেশি থামা নেই তবে সালারে থামবে। মাঝে দুবার, তাই ভিড় ঠেলে উঠে পড়লাম।

সালারে নেমে বাজার পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে যেতে না যেতেই একটা বাদুড়ঝোলা বাস হর্ন দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। পরেরটার জন্য যেটায় বসলাম সেটা দাঁড়িয়েছে একটা গুলমোহরের ছায়ায়, হালকা হাওয়ায় তার বৃন্তচ্যুত লাল পাপড়ি মাটিতে ঝরে পড়ছে।

ঘন্টা দেড়েকের বাস-জার্নি শেষে নামলাম কালীবাড়ি মোড়ে। চৌমাথা। পুবদিক গেছে কান্দির রাজবাড়ির দিকে, দক্ষিণ দিক থেকে আমরা আসছি, যাবো পশ্চিমে। বাসটা উত্তরমুখো চলে গেল। বাস থেকে নেমে রফা করে ফেললাম সস্তার তিনচাকায়, মাথাপিছু পাঁচটাকা। পোড়া তেলের গন্ধ ছেড়ে গোঁ গোঁ আওয়াজে আমাদের নিয়ে সে ছুটল গুন্দরিয়া, ভালো নাম গুনানন্দবাটী।

নামলাম কামারশালার সামনে। হাপর তখনও হাঁপিয়ে মরছে, হাতুড়ির বিরাম নেই। একটা মাটির পায়ে চলা রাস্তা এঁকেবেঁকে সেঁধিয়ে গেছে গ্রামের ভেতরে। চলেছি সাতভাইচম্পাদের বাড়ি। পথের বাঁদিকটায় অনেকখানি ফাঁকা খেত, জলের অভাবে চাষ হয়নি, শুকিয়ে আসা ডোবার জলের যোগানে কাঠা দুয়েকে কচু লাগিয়েছে কেউ। একটা হিজলগাছ, ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে দাঁড়িয়ে। গোড়ায় বাঁধা গরু, নাদমাখা ল্যাজে ঝাপট মারছে মাছির জ্বালাতনে।

আঁশফলের গাছটায় গোলাপীফুল ছেয়ে আছে, বিছিয়ে আছে নীচেও। দূরে দূরে নতুন কোঠা উঠেছে আরবের পয়সায়। বেচারী গ্রামের টুঁটি বেশ কায়দায় টিপে ধরতে এগিয়ে আসছে শহর।

যে বাড়িতে উঠলাম কর্তা বর্ধিষ্ণু চাষি, চারছেলে-বউ-নাতি-নাতনি, ভাই, তাদের পরিবার সবাই মিলে পাশাপাশি থাকা। ভরদুপুরের বেলা একটু গড়িয়েছে, আমরাও পৌঁছেছি, তাই আসন পড়ল, আমরাও বসে পড়লাম। অতিথিপর্ব মিটিয়ে বাড়ির মেয়েরা বসলেন প্রশস্ত উঠানে। শাশুড়ি, চারবউ, তাদের ছোটরা। কে যে কার বাচ্চাকে খাইয়ে দিচ্ছে বুঝতে একটু সময় লেগে গেল। হাজার হলেও আমরা শহুরে-শিক্ষিত, গেঁয়ো ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে সময় লাগবে না?

এ বাড়ির বড়োছেলে বলেছিল আজকেই বোলান হবে। গিয়ে জানলাম তার সত্যের অপলাপের কারণ। বোলানের গ্রামটা ওদের বাড়ি থেকে আরও কিছুটা দূরে দিদির নিজের গ্রামে। পাছে আমরা ওদের বাড়িটা শুধুই বুড়ি ছুঁয়ে চলে যাই তাই সে নিজের বাড়িতে একরাত ধরে রাখবে বলে আমাদের ডেকে এনেছে।

বেলা প্রায় তিনটে। বাড়ির গিন্নির এখন বিশ্রামের সময়। ছোটোবউ গেল তার মাস নয়েকের মেয়েটাকে ঘুম পাড়াতে, মেজ-সেজও গেল নিজেদের ঘরে। তিনি বসলেন উঠোনের একপাশে, ধামায় ভরা কুলত্থ-কলাই, সামনে জাঁতা, সঙ্গী বড়োবউ, দুজনে ডাল কুটতে বসলেন। রক্ত-সম্পর্কের বেড়া-ডিঙোনো এবাড়ি আসলে দিদির আপন মামীর বাপের বাড়ি আর মামার শ্বশুরবাড়ি।

কোনও এক বিভ্রাটে বিদ্যুৎ নেই বেশ কয়েকটা বাড়িতে। এ বাড়িটাও সেই বিভ্রাটের অংশীদার। নিঃসঙ্কোচে এরা ছেড়ে দিয়েছে ওদের ঘর-বিছানা, মাটিতে ছাদে ব্যবস্থা করেছে নিজেদের, উপায়ান্তরে আমরা সঙ্কুচিত হয়েছি। এ ভাবেই রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম কালী-বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেই চৌমাথায় এসে এবার পুবমুখো। কয়েক পা এগিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে গেছে রাস্তাটা। অনেকটা হেঁটে এসে একটা বিশাল বটগাছ, চারপাশে তার লম্বা ঝুরি মাটি ছুঁয়েছে, তারি পশ্চিমমুখো মন্দিরটা। সামনে নবগ্রহ মন্দির, তার ডাইনে ছোট্ট প্রবেশদ্বার। ভিতরে মস্ত চত্বরের মাঝখানে একটা বকুল গাছ, পাড় বাঁধানো। গাছের গায়ে হেলানো কয়েকটা লম্বা ত্রিশূল, নীচে প্রোথিত হাড়কাঠ। ডানদিকে কয়েকটা শিবমন্দির, পশ্চিমের খিড়কিপ্রান্তে অর্ধবৃত্তাকারে বাঁধানো এক বটগাছের তলায় ডাঁইকরা অগুন্তি পোড়ামাটির মানত ঘোড়া। শিব-বারান্দার চাতালে আংটায় আট-কানো বঁটিতে দুজন বয়স্কা ফল কাটছেন, পাশে একটি ছেলে উদাস বসে আছে, মর্কটের দলের দাপাদাপিতে বকুলফল ঝরে পড়ছে নীচে।

এখানকার মূর্তি সচারচর যেমন দেখি তেমন নয়। যেন মনে হয় একটি বিশাল মুখাকৃতি, তার সোনার চোখ, নাক, ওষ্ঠ। নাকে নথ, কপালে তার তৃতীয় নয়ন। রক্তাম্বরী ঘোমটা আবৃতা। রূপার লম্বা জিহ্বারূপী রজোগুণকে দন্তরূপী শতগুণ দিয়ে দমন করার চিরায়ত জ্ঞান প্রদর্শন করছেন বরাভয়দাত্রী। সকালের আরতি হচ্ছে, ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং।

অনুসন্ধিৎসায় দক্ষিণের দরজায় পা দিয়েছিলাম। ওদিকে বেশ খানিকটা জায়গা। আম-কাঁঠালের গাছ, টগর, মালতীলতাও আছে। পলেস্তারা খসা একটা ছোটো ঘর-বারান্দা, ভিতরে আভরণ খসে আসা রমণীমোহন সাথে লীলাবতী, একে অপরের কাঁধে ভর দিয়ে, বড়ো অসহায় যেন। সহায়সম্বলহীন মানুষের-ই যেন প্রতিরূপ। হে ঈশ্বর, তুমিও...। বারান্দার দেওয়ালে ঝুলছে একটা খোল, আধময়লা একটা ধুতি, একটা নামাবলী। এক নিঃশব্দ উপস্থিতি, হয়ত কেউ আছে যে নিঃসীম অন্ধকারে অথবা ভরা জ্যোৎস্নায় একবার গেয়ে ওঠে তার নামগান। একপাশে ভোগের ঘর। হয়ত কেউ তার পিতৃ-মাতৃ স্মৃতিতে করে দিয়েছিল আজ সেটা নেহাত আস্তাকুঁড়। শুকনো মালা, পোড়াকাঠ, ভাঙা মাটির তৈজস, বোলতার-চাক কী নেই সেখানে।

বাইরে এলাম, এবার যাব কান্দি। বেরিয়ে দেখি সেই বটগাছটার ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঠিক যেন স্পটলাইট আর গাছতলার মোটা শিকড়ের ওপর বসে আছেন এক বৃদ্ধা, হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়োকরা পাশে একটা পুঁটুলি। নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়, নিঃসম্বল। ঘোলাটে দুটো চোখ যেন নিষ্পলক চেয়ে আছে আমাদের চলার পথে। বট তাকে বসতে দিয়েছে নিজের ছায়ায়, সবুজ পাতার ব্যজনে তাকে বাতাস করছে।

বাজারপথটা বেশ ঘিঞ্জি আর সরু। সেই পথেই বাজার, ভ্যানরিকশা, গরু, জঞ্জাল সব মিলিয়ে বেশ সরগরম। ওই পথেই একসময়ের তোরণদ্বার। আমরা ঢুকে পড়লাম স্কুলবাড়ির ভিতর দিয়ে। রাজবাড়ির একেবারের সামনের অংশটা দখল করেছে এলাকার লোকজন। গ্রিলকারখানা, টিনেরবাক্স, লেপ-তোষক, সূচিশিক্ষা সবাই মিলে। পড়ে আছে তিনটি মাঝারি রথ ঝুলে আসা খিলান পথের পাশে। একেবারে ডান দিকে মোটা দেওয়ালের পাশ দিয়ে ঢুকলেই সামনে দুজন উর্দিধারী বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে, ওরা মৃণ্ময়। দুপাশে কয়েকটা ঘর, পুবদিকে মস্ত ঠাকুরদালান। বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় মাটি

স্যাঁতসেঁতে, উঠোন চত্বরটা পেরিয়ে তিনমহলায় ঢুকতেই সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল এবং রাজকীয় রাসমঞ্চ, চারপাশে চৌবন্দি চওড়া দালান সহ ঘরের সারি। মোটামোটা খিলান, থাম, বড়ো বড়ো দরজা, দেওয়ালে পঙ্খের কাজকরা ফুলপাতার নকশা। এ বাড়ি আজ গৃহদেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। দক্ষিণের মাঝখানের ঘরটিতে রেশমী বিছানায় স্বয়ং রাধাবল্লভ সাথে রাধারানি। রাসমঞ্চের থামে থামে বাঁধানো পুরানো বটতলা-ছাপাই ননীচোর, কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, বিশ্বরূপদর্শন-এর মতো নানান ছবি। পিছনে মস্ত রসুইঘর, ভাঁড়ারঘর, জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এখানকার রাসের খ্যাতি আছে, বারান্দায় জড়ো হয়ে আছে অনেক মাটির মূর্তি।

আবার ফিরে আসা, যাওয়া পথে-ই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। যখন বেরিয়ে এলাম অল্প পরিচিত ও বাড়ির মায়েরা চিকচিকে চোখে পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে। আমাদের চোখেও সংক্রমণের আশঙ্কায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মাঠের ধারে কয়েকটা বালক খেলায় মেতেছে অতি তুচ্ছ উপকরণে। ফেলে দেওয়া গাঁদার মালায় ওরা বর-বউ সেজেছে, মাটির ধুলো ওদের সিঁদুর। খসেপড়া দুধে-দাঁতের ফোকর গলে ওদের অনাবিল হাসির হল্লা, বুকে দুধজমা শিষধানের খেতের ওপর দিয়ে বাতাসে ভর করে পশ্চিমে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দুটো বাড়ির দূরত্ব দু-আড়াই কিলোমিটার। এ পথটা আমরা অরুণের মোটরবাইকে কয়েক ক্ষেপে পৌঁছলাম প্রায় পঞ্চাশে শিরদাঁড়ার নমনীয়তার পরীক্ষা দিতে দিতে। উন্নয়নের প্রভূত ধাক্কায় পথের গায়ে যেন কুষ্ঠাক্রান্ত দগদগে ঘা। বিচিত্র তার ঢেউ, বিচিত্র তার খন্দ। খানাখন্দ, খেত, পুকুরের গা বেয়ে চলা রাস্তার এক বাঁকে দাঁড়িয়ে ক-জন আমাদের অভ্যর্থনায়।

মেয়ে বাড়ি ফেরার আবেগ তো আমাদের আশ্বিনে। জ্যৈষ্ঠের এ সন্ধ্যার আপ্যায়নও বড় প্রাণবন্ত। হাসি আর কথার গলাগলিতে সঙ্গত দূরে ঢাকের বোল। সন্ধ্যার প্রদক্ষিণে সন্ন্যাসীর দল বেরিয়েছে, পরণে রক্তলাল বসন-উত্তরীয় হাতে বেত-খণ্ড, ওরা চলেছে মন্দিরতলায়। আজ বোলান।

অনেকখানি চত্বর নিয়ে অনেকদিন হয়ে গেল বুড়ো অশ্বত্থের। সেই ধর্মরাজের দেউড়ির দারোয়ান। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে সরু বারান্দার কোলে ছোট্ট এক চিলতে ঘরে রাজার দরবার। নীচে বৃষ্টিভেজা মাটিতে যে যেমন পেরেছে খড়, চাটাই, বস্তা পেতে বসেছে, কেউবা দারোয়ানের গায়ে গা এলিয়ে। আকাশে তেমন তারাদের ভিড় নেই, চাঁদও কোথায় যেন ঘাপটি মেরেছে। নীচেও তেমন আলো নেই, ছোট্ট একটা ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে, দু-খুঁটিতে দুটি মাত্র টিউবলাইটে আলোর সংস্থান ছাপোষা গেরস্থের মাসান্তে সিকি-আধুলির মতো। হারমোনিয়ামের বদলে এখন সস্তার কী-বোর্ড যাত্রার অর্কেস্টো বাজাচ্ছে, সঙ্গতে ডুগি-তবলা। একদিকে প্রম্পটার, অন্যদিকে বাজনদার আর ধুয়োর দল, গান যখন শুরু হল রাত তখন দুই প্রহরের বেড়া ডিঙিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। দক্ষিণবঙ্গের সম্ভবত দুটি জেলায় এখনও টিকে আছে বোলানগান। মুর্শিদাবাদ আর মালদহে, সাথে আলকাপ, মড়ানাচানো। বোলানে আমরা এখনও খুঁজে পাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথার নানা কাহিনি, বর্তমানে এসে মিশেছে সামাজিক নানা বিষয়। আলকাপে পাই কিছুটা খেউড় কিছুটা গল্পের সংমিশ্রণ আর মড়ানাচানো কোনওভাবে বেওয়ারিশ একটি দেহ যোগাড় হলে তা সে যেমনই হোক তাকে একটি লম্বা বাঁশের মাঝখানে বেঁধে দুদিকে চারজন করে আটজন কাঁধে নিয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে থাকা। অমানবিক হলেও এ রেওয়াজ বহু দিনের, তবে বর্তমানে এ প্রথা কমে এসেছে যদিও কুড়মুন বা সিঙ্গির গাজনে আমরা করোটি নৃত্য আজও দেখতে পাই।

বোলান, যাত্রাপালার অত্যন্ত নিম্নমানের সহজিয়া উপস্থাপনা। আমার দেখা যে বোলানের কথা এখানে বলছি সেখানে উপকরণ অত্যন্ত সামান্য। বাড়ির মহিলাদের শাড়ি-ব্লাউজ, বিয়ের মুকুট, ভেল বা ওড়না, কাগজের মালা, বাঁখারির ধনুক, রাংতার তরোয়াল এ সব নিয়েই দিন তিনেকের তাজা বাতাস বুকের হাপরে টেনে নেওয়া।

আধো-অন্ধকারে চারপাশে মানুষজন ভিড় করেছে। সামনের সারিতে ছেলেপুলের দল যথারীতি হট্টগোলে মাতোয়ারা, ঢিলের টুকরো এসে পড়ছে মাথায়, তাই নিয়ে সন্দেহ, হাতাহাতি। সংসারের কাজ সেরে মহিলারা বসেছে একপাশে, কেউ পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়ে, কেউবা পা ছড়িয়ে।

ওই ঘন্টা পড়ল। আজ দুটি পালা। প্রথমে রামের সাথে লবকুশের লড়াই, তারপর তরণীসেন বধ। জ্যৈষ্ঠের এই গরমে রামচন্দ্রের সাটিনের গোলাপী জামা ঘামে ভিজে উঠেছে, মুখের রং গলছে, তার ওপর অভ্রের চকচকানি আর অ-পেশাদারি নার্ভাসনেস তাকে বিব্রত করছে বারবার। লবকুশের পরণে স্যান্ডোগেঞ্জি আর বাড়ির কারও একরঙা শাড়ি, কৈশোর পেরিয়ে আসা দুটি ছেলে মাঝেমাঝেই চোখবুজে ডায়ালগ বলে চলে যেতে পারলে বাঁচে।

সরমা বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের পেশিবহুল এক পুরুষ, ডানহাতের কনুইয়ে ঝুলছে লালসুতোয় বাঁধা তামার মাদুলি, ঘন লালরঙা শাড়ি-ব্লাউজ,

পিছনে বেরিয়ে আসা অন্তর্বাস, মাথার পরচুল বারেবারে নেমে আসছে মুখের ওপর। হনুমান মাটিতে বসেছিল সর্টপ্যান্ট পরে, হঠাৎই এক আঁটি বিচুলিকে গামছা জড়িয়ে গদা বানিয়ে লাফিয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর। বিভীষণের বেশ কষ্ট হচ্ছে তার-ই প্রায় সমবয়সী পুত্ররূপী তরণীকে কাঁধে তুলতে। এমনই সব চরিত্রায়ণের মধ্যে কোথা থেকে এক মদ্যপ উঠে পড়েছে, আদুড় গা, লুঙ্গির গিঁঠ খুলে যাবার অবস্থায়। সেও অংশগ্রহণ করবে এমনই মনোভাব।

রাত বাড়ছে। মাইকের তীব্র আওয়াজে আশেপাশের গাছপালার আদত বাসিন্দাদের মস্ত অসুবিধা, তারা মাঝেমাঝেই চিৎকার করে উঠছে। এই দুটোদিন এমনই চলবে। পরেরদিন সকালবেলা আবার হাজির হলাম মন্দিরতলায়, এখন কবিগান চলছে। নদীয়ার দুই কবির লড়াইয়ের মূল বিষয় ত্রেতা আর দ্বাপর যুগের দুই বিষ্ণু অনুরাগী পবনপুত্র হনুমান আর তৃতীয়পাণ্ডবের মধ্যে কে বড়?

পুরুষেরা কাজেকর্মে যাওয়ায় তাদের উপস্থিতি কিছুটা কম হলেও মহিলারা বিশেষত বয়স্করা আবার ফিরে এসেছেন। রাত জাগার ক্লান্তি তাদের শরীরে, ঘুমে ঢুলছেন কেউ, কেউবা সটান ঘুমে। এক-ই জায়গায় সাদাথান শাড়ির জটলা, একঝলকে মনে হয় কত মানুষই পরিজন ছেড়ে চলে গেছে চিরতরে।

আজ ধর্মরাজের গাজন। ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসীর দল যাবে একটু দূরের এক গ্রামের বটতলায়। অন্য গ্রামের সন্ন্যাসীরা আসবে সেখানে। বটতলার হাত দশেক দূরে একটা ডোবা, জলের চেয়ে কচুরিপানার ভরভরন্ত বেশি। পশ্চিমে আর একটা পুকুর, একদল তাতে নেমে স্নান সেরে এসে দাঁড়িয়েছে বাঁধানো চত্বরে। ক্রমশ জায়গাটা একেবারে ভরে গেল। পুরোহিত পুজোয় বসেছেন, চারদিকে উপাচার, জলপূর্ণ ঘড়া, ধুনার ধোঁয়া, ঢাকের বোল। এমন সময় এক মহিলা, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, সবজে ব্লাউজ, কোরা শাড়ি, কোমরে বাঁধা নতুন গামছা, বাঁ-হাতের মাঝে গুচ্ছের মাদুলি —পুজোর সামান্য উপাচারটি স্বস্থানে রেখেই আছাড় খেয়ে পড়লেন। মুখ ঘষটানো চলছে, যে যেখানে ছিল হুমড়ি খেয়ে তার ওপরে, আশপাশে ফিসফিস শুরু হয়ে গেল যে নিশ্চয় খুঁত হয়েছে এবং খুঁতটি হল সন্ন্যাসীরা পানাপুকুরের হাঁটুজলে কেন স্নান সারেনি? ওই অত মানুষ আবার গেল স্নান করতে। এদিকে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে মহিলা উপাচার সাজাতে বসেছে, তার চানের দরকার নেই —এই না হলে বাবার মহিমা!

এরপর গ্রাম প্রদক্ষিণ। যে যার পাড়ায় ফিরবে, ফিরতে বেলাও হল। ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত ওরা। সঙ্গে ঢাকি, ধুনুচি নাচ আর ছেলে থেকে বুড়ো সকলে মিলে নাচের তালে পা মেলানো। কয়েকদিনের এ আনন্দ ওরা নিঃশেষে চেটেপুটে বুকের হাপরে ভরে নেবে।

মন্দিরতলা এখন লোকে লোকারণ্য। সন্ন্যাসীদের বয়ে আনা ঘড়ার জল ওদের কাছে মহা পুণ্যবারি। কয়েকফোঁটা জলের জন্য কী আকুলি এই মানুষ গুলোর। মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে সন্ন্যাসীর দল সটান শুয়েছে মাটিতে, মূল সন্ন্যাসী তাদের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে। তারপর ওদের পারণ শেষে গার্হস্থ্যে ফেরা, স্বাভাবিক জীবনচ্ছন্দে একটা বছরের অপেক্ষা আবারও এই দিনটার জন্য।

আজও বোলান। কাল হবে আলকাপ। আজকের বোলানের পালা মহাভারতের একাংশ। যথারীতি পরণে রোজকার প্যান্ট-সার্ট তার ওপরে জরি বসানো রঙিন ফতুয়া, নকল গোঁফ, তেল চকচকে চুলের আলবোট কুচক্রী দুর্যোধন ফন্দি আঁটছে কী করে কাকার ছেলেদের কাত করা যায়।

সেই হাসি, সেই খেলা, সেই ঢিলছোঁড়া, সেই ঘুমে ঢুলে পড়া চোখ, সেই চেনা কাহিনি। তবুও যুগযুগ ধরে সকলের অল্পবিস্তর জানা এ মহাকাব্যের চিত্রনাট্য মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে আজও গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত পাড়ায়, আর এ-সবের মধ্য দিয়েই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে চলেছে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি।

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

পেশায় শিক্ষক। নেশা ভ্রমণ। বাংলার সংস্কৃতি আর ছড়িয়ে থাকা ইতিহাসে বিশেষ আগ্রহ। কলম কাগজে সেসব অভিজ্ঞতা বিনিময়।

পরশপাথর প্রকাশনা

জেলা ভ্রমণের অভূতপূর্ব নির্দেশিকা

রত্না ভট্টাচার্য

পায়ে পায়ে হুগলি

রত্না ভট্টাচার্য শক্তি ভট্টাচার্য

পায়ে পায়ে বীরভূম

পায়ে পায়ে পুরুলিয়া

পায়ে পায়ে হাওড়া

পায়ে পায়ে নদিয়া

পায়ে পায়ে বাঁকুড়া

পায়ে পায়ে মেদিনীপুর (যন্ত্রস্থ)

চা-বাগানের পথে পথে

অরুণ সেনগুপ্ত

মিরিক বাজারে শেয়ার জিপ ছেড়ে দিলাম। মোমো আর চা খেয়ে হাঁটা শুরু 'ওকাইটি'-র চা-বাগানের উদ্দেশে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, পাকা রাস্তা-দুধারে চা-বাগান রেখে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। আমরাও চলেছি তাল রেখে সেই ছবির মধ্যে দিয়ে। প্রায় নির্জন রাস্তায় বাগানের মেয়েরা দল বেঁধে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছে। মাঝের একটা অর্কিড বাগান ও একটা সুন্দর নার্সারিতে বিশ্রাম শেষে আবার এগিয়ে চলা। ছ' কিলোমিটার পেরিয়ে পুরনো এই চা-বাগানে পৌছাতে সন্ধে নেমে এল। মুদিখানার সাথে চা-এর দোকানে টিফিন সেরে রাতে সেখানেই থাকতে চাইলাম। পরদিন সকালেই সীমান্ত পেরিয়ে শ্রীঅন্তু যাব শুনে আশ্রয়ের সন্ধানে মালিক ব্যস্ত হলেন এবং প্রতিবেশী বৌদ্ধ পরিবারের দোতলার সুন্দর সাজানো ঘরে রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, তবে রাতে খাবার মিলবে না এই শর্তে। অবশেষে রাতের খাবারের ব্যবস্থা হল নিচে সঞ্জু শেরপার রেস্টুরেন্টে।

খাবার খেতে খেতে সঞ্জু শেরপার সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। দরদাম করে ঠিক হল তিনি আমাদের শ্রীঅন্তু গ্রামে পৌঁছে দেবেন ৮০০ টাকার বিনিময়ে। আমাদের থাকার জায়গাটা তিন চা-বাগানের মাঝে। 'ওকাইটি' ছাড়াও আরও দুটি চা-বাগান মিশেছে এখানে। 'ওকাইটি' চা-বাগান ১৫০ বছরের পুরনো। এখানকার চা

দেশ-বিদেশে পাড়ি দেয়। বহু বিখ্যাত মানুষ যেমন, জওহরলাল নেহরু, ক্রুসচেভ, রানি এলিজাবেথের মতো মানুষেরা এই চা-বাগানের চা খেতেন নিয়মিত। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে নাকি এখনও নিয়মিত চা যায় এই বাগান থেকেই। এমনই এক প্রাচীন ও বিখ্যাত চা-বাগান দেখার আগ্রহ এবং নতুন পথে পূর্ব নেপালের চা-বাগান সমৃদ্ধ ইলাম জেলায় পৌঁছে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এ পথে আসা।

ভোরে ঘুম ভাঙলো বৌদ্ধধর্মের প্রার্থনা সংগীতে। কাচের জানলার হালকা পর্দা সরাতেই চা-বাগান পেরিয়ে রোদ্দুর ঢুকে পড়ল ঘরে। প্রার্থনা সংগীত অনুসরণ করে প্রার্থনাকক্ষে পৌঁছে গেলাম। বাড়ির মালিক ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির সামনে। বাড়ির সামনে চা-বাগান আর পথের কিনারায় রঙিন প্রার্থনা-পতাকার মিছিল হিমেল হাওয়ায় দুলছে। রাস্তা বেয়ে মানুষ আসে যায়। বাগানের মেয়েরা ছোটো ছোটো দলে দ্রুত চলে যায় পিঠে লম্বাটে খালি ঝুড়ি নিয়ে, পায়ে গাম বুটের দাপট আর আঁটোসাঁটো পোশাকে। পিঠে স্কুল ব্যাগ নিয়ে কচিকাঁচার কিচির-মিচির। আমরাও বেড়িয়ে পরলাম চা-বাগান দেখতে। উত্তর-দক্ষিণে পথটা চলে গেছে বাঁক নিয়ে দূরে। ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে সাজানো চা-এর বাগান, বাঁয়ে বসতবাড়ি, রেস্টুরেন্ট। এখানে শুধুই চা-এর দোকান, একটাও হোটেল নেই। বাগানে শিশির ফোঁটা পাতায় নিয়ে প্রতিটা গাছ এক একটা বনসাই। কোনো গাছ এত পুরনো যে পরগাছারা সংসার বেঁধেছে তাদের ডালে। অনেক গাছে ঘিয়ে রঙের ফুল ধরেছে আর কলকে ফলের মতো খুব ছোটো ফল ধরেছে। এসব দেখতে দেখতে ভালো লাগা আরও দীর্ঘ হল। সঞ্জু শেরপা হাজির। ও গাছগুলোকে বুশ বলছে। তিন রকমের বুশ। আসাম বুশ, চায়না বুশ আর ক্লোন বুশ। তাদের মধ্যে আবার অনেক ভ্যারাইটি। ক্লোন বুশের মধ্যে মহারাজা, সেলিম বুং অন্যতম। এরা সব উঁচু মানের বুশ।

রাতের আশ্রয় দেওয়ায় গৃহস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবার তৈরি হাঁটার জন্য। নতুন পথে, নেপালে। চা-বাগান থেকে চা-বাগানে। এবার শুধু নামা আর মুগ্ধ হওয়া ছাড়া কোনও কাজ নেই। শহুরে ফুসফুসটাও বিশ্রাম পাচ্ছে। বাগানে বাগানে মেয়েরা কাজে ব্যস্ত, প্রতি দলের সঙ্গে একজন দলনেত্রী পর্যবেক্ষণ করছে। হাঁটতে হাঁটতে পাকারাস্তা শেষ এবার মেঠো পথ এগিয়ে চলেছে। দূরে স্পষ্ট হল মেচি নদী ও একঘরের গ্রাম মেচি। আর এক কিলোমিটার হাঁটলে আমরা সীমান্তে পৌঁছে যাব। চা গাছের গোড়ায় গোড়ায় খাবরের ব্যাগ বাঁধা। মধ্যাহ্ন বিরতিতে সবাই সেই ব্যাগ থেকে খাবার নিয়ে দলবেঁধে রাস্তার ধারে খাবার খেতে বসে পড়েছে। আমরাও নেমে এলাম গ্রামে। মোট পাঁচ কিলোমিটার হাঁটলাম আমরা।

বাড়ির মালিক, গ্রামের মালিক, জ্যাকি। তাঁর গোটারি আছে, পিগারি আছে, আছে চা ও খাবারের দোকান। ফুলবাগান দিয়ে সাজানো কাঠের বাড়িকে ঘিরে আছে 'ওকাইটি'-এর চা-বাগান। অল্প দূরে তির তির করে বয়ে চলেছে মেচি। এখানে রাতে পথিকের থাকার ব্যবস্থা আছে।

ছোট্ট ছোট্ট দুটো সাঁকো মেচির ওপর। ওরাই সীমান্ত পার করে দেবে আমাদের। সীমান্তে গাছেদের কোনো ভেদাভেদ নেই। দুপারেই চা-বাগান আর একই প্রকৃতির উদ্ভিদ। জ্যাকির সঙ্গে গল্প করে, খাবার খেয়ে, বিদায় জানিয়ে সাঁকো পেরোলাম। এবার বিদেশ। কথা ছিল সঞ্জু শেরপা আমাদের শ্রীঅন্তু গ্রামে পৌঁছে দেবে। সেই মতো ইচ্ছে না থাকলেও বন্ধুকে বিদায় জানাতেই হল। হালকা উতরাই বেয়ে, চা-বাগান, চাষের ক্ষেত, বাঁশ বাগান, বাড়ির উঠোন পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম অন্তু পোখরি। অন্তু পোখরি বেশ বড়ো এক জলা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল এসে জমা হয় এখানে। পোখরির চার পাশে চা-বাগান। চা-বাগানের ছবি পোখরির জলে মায়াজাল তৈরি করেছে। বিকেল শেষে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই পথিকের সাহায্য নিয়ে 'মগর' পরিবারের হোম স্টে-তে পৌঁছেগেলাম। এখানে ২৫-৩০ জন অতিথির থাকার দারুণ ব্যবস্থা। আজ এখানেই রাত্রিবাস।

খুব ভোরে প্রণিতা ডেকে তুলল আমাদের। প্রণিতা 'মগর' পরিবারের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ও আমাদের আজকের গাইড। চা-বাগান, ঘন পাইনবন পেরিয়ে আবছা আলোয় আমরা চললাম সানরাইজ ভিউ পয়েন্টে। পুব আকাশ তখন লালে লাল। ধীরে ধীরে আলোর বন্যা চারপাশে। এবার শুধু মুগ্ধ হওয়ার পালা। দূরে পাহাড়ের গায়ে মেঘের চাদর, তার ফাঁকে ফাঁকে 'ওকাইটি'। এত আলোর মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে তখনও অন্ধকার। সেই-আঁধারে রুপোলি রেখায় চিক্‌চিক্ করছে মেচি। এবার ফেরার পালা। পাইনবনের ফাঁকে মেঠোপথ নেমেছে নিচে। তির্যক আলো পাইনের বনে। প্রণিতার সঙ্গে ফিরছি আমরা। হঠাৎ প্রণিতার তর্জনী অনুসরণ করে মুগ্ধ হলাম, ওই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দূর থেকে দেখছে আমাদের! একটা সুন্দর সকাল উপহার পেলাম।

ছবি- লেখক

ড. অরুণ সেনগুপ্ত
শিক্ষক, ছবি তোলা আর ভ্রমণে প্রবল আগ্রহ সঙ্গে ডাইরির পাতায় সঞ্চয় করে রাখা।

মর্ত্যের নন্দন কানন... বার্সে

দেবনারায়ণ মাঝি

"নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ।"

স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, হোস্টেলে থাকি। স্কলারশিপের টাকা জমিয়ে একটা ওয়াকম্যানও কিনেছি। হোস্টেলের এক দাদা একটা ক্যাসেট শুনতে দিয়েছিল– 'শেষের কবিতা'। মনে খুব দাগ ফেলেছিল। তখন থেকেই মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল পাহাড়ের বুকে রডোডেনড্রন দেখার স্বপ্ন। কর্মজীবনে প্রবেশের পর ভারতের অনেক জায়গা দেখার সুযোগ হয়েছে কিন্তু আঠারোর সেই রডোডেনড্রনের স্বপ্নকে ভুলতে পারিনি।

সহকর্মীদের সাথে গল্পের ফাঁকে হঠাৎ একদিন আমার এক সিনিয়র সহকর্মী, অরুণদা রডোডেনড্রন দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। সেই আঠারোতে দেখা স্বপ্ন সার্থক হবে ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম।

২৭ মার্চ, আমরা চারজন সহকর্মী অরুণদা, চন্দনদা, সমরদা ও আমি শিয়ালদা থেকে দার্জিলিং মেলে চেপে পড়লাম। আমাদের গন্তব্য পশ্চিম সিকিমের বার্সে। আমার তিনজন সহকর্মী বয়সে পঞ্চাশোর্ধ আর আমি তখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।

ছবি- লেখক

পরদিন সকালে ঠিক সময়ে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছোলাম। ফ্রেশ হয়ে প্রাতরাশ সেরে জোরথাং যাওয়ার জিপস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। একটা শেয়ার জিপে ড্রাইভারের পিছনের সিটে আমরা চারজন, বাকিরা সিকিমের কয়েকটি ছেলে ও দু'জন ভদ্রমহিলা। জিপ ছুটে চলেছে সুকনা, তিস্তা, মহানন্দা অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে। দুদিকে শালের জঙ্গল, গাছগুলি পাতা ঝরিয়ে নতুন রূপে নিজেদের কে সাজিয়ে নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। যাত্রাপথের শুরুটা মনকে ছুঁয়ে গেল। কিছু পরে আমাদের পথ দেখানোর জন্য হাজির হল সুন্দরী তিস্তা। তার গভীর চোখে চোখ রেখে তাকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। এবার আমাদের সঙ্গী হল আরও কয়েকজন, নানা প্রজাতির পাখির কূজন, রংবেরঙের পাহাড়ি ফুলের অনাবিল হাসি, দুপাশে গাছের সারি– সবাই যেন আমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। এদের সাথে ভাব বিনিময় করতে করতে দু'ঘণ্টা যে কীভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। পৌঁছে গেলাম জোরথাং। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখলাম ওখরেগামী একটা বাস ছাড়ছে। দুপুরের খাবার না খেয়ে টিকিট কেটে বাসটিতে উঠে পড়লাম।

জোরথাং-এর অবস্থান তিস্তার উপনদী রঙ্গীতের তীরে। শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় ৪৭ কিলোমিটার, উচ্চতা ১,০৫০ ফুট। শুরুর দিকে রাস্তাও বিশেষ ভালো নয়, ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। আমাদের গন্তব্য ১০৬ কিলোমিটার দূরের ওখরে। উচ্চতা প্রায় ৯,০০০ ফুট। বার্সে যেতে গেলে ওখরে অবধি বাস যায়। দুপুরের খাওয়া হয়নি। বাসের মধ্যে মুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা শুরু হল। সমরদা অদ্ভুত দক্ষতায় এক বিশেষ ধরনের কাগজের ঠোঙা বানিয়ে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। বানানোর এই পদ্ধতি আমি আগে দেখিনি, চলন্ত গাড়িতে সত্যি বিশেষ উপযোগী। বাসে যাত্রী বিশেষ নেই, মুড়িপর্ব সেরে সমরদা বাসের কমবয়সী কন্ডাক্টরটিকে পাশে বসিয়ে গল্প শুরু করলেন। কিছুপরে দেখলাম কন্ডাক্টর ভাইটি তার কাজ ভুলে সমরদার সাথে গল্পে মশগুল।

পথে পড়ল এক প্রশস্ত উপত্যকায় ছোট্ট সুন্দর গ্রাম দ্রামদিন, রয়েছে সাঁইবাবার মন্দির। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে গ্রামটিকে খুবই মনে ধরল। বাসে যাওয়ার কারণে নেমে দেখা হল না। তবে ঠিক করলাম হয়তো কোনও দিন আসব। আর একটু এগিয়ে বাসটি পনেরো মিনিটের জন্য থামল। আমরা নামলাম। জায়গাটির নাম সোমবরিয়া। দোকানপাট, বাড়ি-ঘর নিয়ে বেশ জমজমাট জায়গাটি। একটা রেস্তোরাঁয় চাউমিন খেয়ে বাসে উঠলাম। ওখরেতে পৌঁছোলাম প্রায় ৫টা নাগাদ। নামার সময় কন্ডাক্টর ভাইটি তার বিয়েতে আসার জন্য সমরদা সহ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানালো। এতক্ষণে বুঝলাম সমরদার সাথে অন্তরঙ্গ গল্পের বিষয়বস্তু। বাসটি ওখরে থেকে বাঁদিকে নিচের দিকে গোর্কের পথ ধরল। নেমেই বাঁদিকের ফুটে রাস্তার পাশেই শেরপা লজের দোতলার একটা ঘরে জায়গা পাওয়া গেল। বড়ো ঘর, চারজন বেশ ভালোভাবেই থাকা যাবে। ব্যাগপত্র রেখে পাশেই মালিকের ভাগ্নীর খাওয়ার দোকানে গিয়ে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে রাতের খাবারের অর্ডার দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

আকাশ মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, দিনমণি আমাদের না জানিয়েই অস্তাচলগামী। খানিক এদিক ওদিক হেঁটে একটা গুম্ফা দেখার জন্য এগোলাম। বেশ অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হল। ছোট্ট সাজানো গুম্ফা, চারদিকে প্রেয়ার ফ্ল্যাগ, ভিতরে বুদ্ধমূর্তি, বাচ্চাদের থাকার জায়গা ইত্যাদি দেখে নীচে নেমে এলাম। বেশি রাত করলাম না। রাতে রুটি, ডাল, সব্জি খেয়ে পরদিন হিলে যাওয়ার গাড়ি ঠিক করে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠলাম। আজও আকাশ মেঘলা। প্রাতরাশ সেরে তৈরি হয়ে ৯ কিলোমিটার দূরের হিলেতে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠলাম। একটাই পিচ রাস্তা, ওখরে থেকে শুরু করে হিলেতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এপথে শেয়ারে গাড়ি পাওয়া যায় না। পুরো গাড়ি ভাড়া করেই যেতে হয়। অনেকে এই পথটাও ট্রেক করেন। একটু এগোতেই দেখা দিল গোলাপী আভায় উজ্জ্বল আমার আঠারো বছর বয়সের সেই স্বপ্নের রডোডেনড্রন। গাড়ি থামিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে এগিয়ে গেলাম ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু অভয়ারণ্যে নির্ভয়ে বেড়ে ওঠা সুন্দরীদের ছোঁয়া বারণ। তাই নিঃশব্দে গোলাপী সুন্দরীদের সাথে মনের কথা বলেই এগোতে হল।

মিনিট ২০ পর পৌঁছেগেলাম হিলেতে। এটি একটি ছোট্ট জায়গা। কয়েকটি ঘর, একটি হোম স্টে আর কয়েকটি দোকান রয়েছে। প্রয়োজনে হিলেতে সিরিন ভাইয়ের হোম স্টে-তে রাত্রিবাস করা যেতে পারে। ব্যবস্থা বেশ ভালোই। হিলে থেকেই শুরু হয় বার্সে রডোডেনড্রন ট্রেক। হিলে থেকে বার্সের দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার। জনপ্রতি ৫০ টাকার টিকিট কেটে অভয়ারণ্যটিতে প্রবেশ করলাম। এর অবস্থান সিঙ্গালীলা রেঞ্জে। ভিতরে প্রবেশ করতেই আমাদের স্বাগত জানালো গভীর নিস্তব্ধতা। শুকনো পাতায় আমাদের পায়ের শব্দেই সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে। ফুট চারেক চওড়া পথ, ডানদিকে খাদ আর বাঁদিকে পাহাড়। প্রায় সমতল পথ, হাঁটতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। জঙ্গল বেশ গভীর, রয়েছে ওক, পাইন, প্রিমুলা, বাঁশ আর বিশালাকার রডোডেনড্রন গাছ। বেশ কিছু গাছের গোড়া

সবুজ মসে ঢেকে নানান রকম রূপ নিয়েছে। আকাশ মেঘলা থাকায় দৃষ্টি বেশি দূর যাচ্ছে না ঠিকই তবে মেঘেদের আদর খেতে খেতে এগিয়ে চলতে বেশ ভালোই লাগছিল। কিছুটা এগোনোর পর পাখিদের কিচির মিচির আওয়াজ, বাতাসের ফিসফিসানি আমাদের পথচলাকে আরও আনন্দঘন করে তুলল। চোখে পড়ল বেশ কিছু পাখিও— কয়েক ধরনের লাফিং থ্রাশ, রোজ-ফিঞ্চ, অ্যাকসেন্টর প্রভৃতি। বন্য জানোয়ারও আছে এখানে। কপাল ভালো থাকলে রেড পাণ্ডাদেরও দেখা পাওয়া যায়। জিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাস্তার ডানদিক আর বামদিক মিলিয়ে মোট চারটি বসার জায়গা রয়েছে। ঘণ্টা দুই হাঁটার পর এমন একটা জায়গায় পৌঁছোলাম দেখে মনে হল মর্ত্যে যদি নন্দনকানন থাকে তাহলে এটিই সেই জায়গা। যেদিকে তাকাই সেদিকেই— 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ'। যেন লাল আর গোলাপির বন্যা। 'শেষের কবিতা'র লাইনগুলি মনে পড়ে গেল। মনে খেলে গেল আনন্দের ঢেউ— ধন্য হল আমার চর্মচক্ষু, ধন্যবাদ জানালাম প্রকৃতিদেবীকে।

বার্সে হল পশ্চিম সিকিমের একটি রডোডেনড্রন অভয়ারণ্য। উচ্চতা ১০,৫০০ ফুট। বেশ কয়েকটি প্রজাতির রডোডেনড্রনের দেখা মেলে। আমরা দেখলাম লাল, গোলাপি আর সাদা। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দেখা মেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুম্ভকর্ণ, পাণ্ডিম ও সিনিয়ালচু সহ আরও কয়েকটি শৃঙ্গ। দুটি মাত্র থাকার জায়গা রয়েছে— দোতলা গুরাস কুঞ্জ আর পাশেই ফরেস্ট ব্যারাক। গুরাসকুঞ্জতে ডর্মিটরি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা আছে আর ঘর আছে একটি, খাওয়া এখানেই মেলে। আমাদের আস্তানা পাশের ফরেস্ট ব্যারাক। চারটি ছোটো ছোটো ঘর আর ডাইনিং হলে ঢালাও বিছানা পাতা আছে। দেখভালের দায়িত্বে থাকা গোপালজীকে ফোনে বলা ছিল। উনি আমাদের সহ-বাথরুম যুক্ত একটি ঘর দিলেন। চারজন বেশ ভালোভাবেই থাকা যাবে। পৌঁছোতেই আমাদের গরম চায়ের কাপ হাতে তুলে দিল। চা খেয়ে আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। যে দিকে তাকাই শুধু লাল আর গোলাপি রডোডেনড্রনের মেলা, প্রতিটি গাছ ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন আজই প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের নির্বাচন। আজ মেঘ আকাশে নয়, আমাদের খুব কাছে, আমাদের ছুঁয়ে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে ফুলের গাছগুলিকে আমাদের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, আবার চোখের সামনে হাজির করছে— এ যেন স্বপ্নের মায়াজাল। গোপালজী ডাক দিলেন, দুপুরের খাবার তৈরি, কাজেই মায়াজাল ছিন্ন করে খাবার টেবিলে বসলাম। ভাত, ডাল, সব্জি, ডিমের ঝোল, স্যালাড সহযোগে দুপুরের খাবার বেশ তৃপ্তিভরে সাঙ্গ হল। এবার বিশ্রামের পালা। উচ্চতাজনিত কারণে শ্বাসের একটু সমস্যা হচ্ছিল। অরুণদা নাক্সভমিকা-৩০ দেওয়াতে তা মন্ত্রের মতো কাজ করল। আমরা তিনজন ঘুমিয়ে পড়লাম, আর অরুণদা ক্যামেরা নিয়ে ফুলেদের সাথে অভিসারে চলে গেলেন। ঘুম ভাঙল অরুণদার ডাকে। আমাদের নিয়ে আবার বাইরে বেরোলেন। অদ্ভুত শান্ত এই জায়গাটিকে মনে হল যেন পৃথিবীর বাইরের কোনও স্বর্গীয় জায়গা। মেঘলা থাকায় কোনও শৃঙ্গই চোখে পড়ল না, মনে কিন্তু কোনও আফশোষ হল না।

সন্ধ্যা নেমে এল। রাতের বার্সে রূপ নিল এক কালো মহিলার। আমরা মোমবাতির আলোয় গোপালজীর সাথে গল্প করে সময় কাটালাম। বেশি রাত না করে রুটি, ডাল, চিকেন খেয়ে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বয়োজ্যেষ্ঠ সমরদা তাঁর জীবনের অনেক না বলা কথা শেয়ার করলেন। শুনতে শুনতে নিদ্রাদেবীর কোমল স্পর্শে আচ্ছন্ন হলাম।

পরদিন সকালে বার্সের রূপকে আরও একবার আস্বাদন করে গোপালজীর তৈরি লুচি, তরকারি খেয়ে আবার আসব এই অঙ্গীকার করে বার্সেকে বিদায় জানিয়ে অন্য পথে আমরা নিচে নেমে এলাম। জায়গাটির নাম বুড়িয়াখোপ, ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। এপথে খুব কম লোকই নামে। রাস্তা খুব খাড়াই। বুড়িয়াখোপের উচ্চতা প্রায় ৬,০০০ ফুট, বার্সে ১০,৫০০ ফুট। ক্রমাগত নিচে নামতে নামতে পায়ে খুব চাপ পড়ছিল। ওখান থেকে জিপে করে জোরথাং হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে গেলাম বিকেল পাঁচটায়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, বিপুল এই ভারতবর্ষকে দেখতে হলে একই জায়গায় একের বেশি বার গেলে বাকী জায়গা দেখার সুযোগ কমে যেতে পারে। কিন্তু বার্সের রূপ দেখার পর আমার মনে হয়েছিল আবার আসব। আমার এই যাওয়া ছিল ২০১০ সালে। পরে ২০১৩ সালের মার্চে আবার যাই। দুবারই বার্সেতে এসেছিল ফুলের বন্যা। খবর নিয়ে জেনেছি তিনবছর পর পর এখানে ফুলের বন্যা আসে। কাজেই মনে হয় ২০১৬ সালে বার্সে আবার সেজে উঠবে তার ভুবনমোহিনী রূপ নিয়ে। আপনারাও তৈরি হন মর্ত্যের নন্দনকাননকে চাক্ষুষ করে নিজেদেরকে ধন্য করতে।

দেবনারায়ণ মাঝি

পেশা শিক্ষকতা, নেশা ভ্রমণ আর অভিজ্ঞতা নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা, ছবি তোলা। ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট নিয়েও পড়াশুনা।

চলুন ত্রিপুরায়

তপতী বর্মন

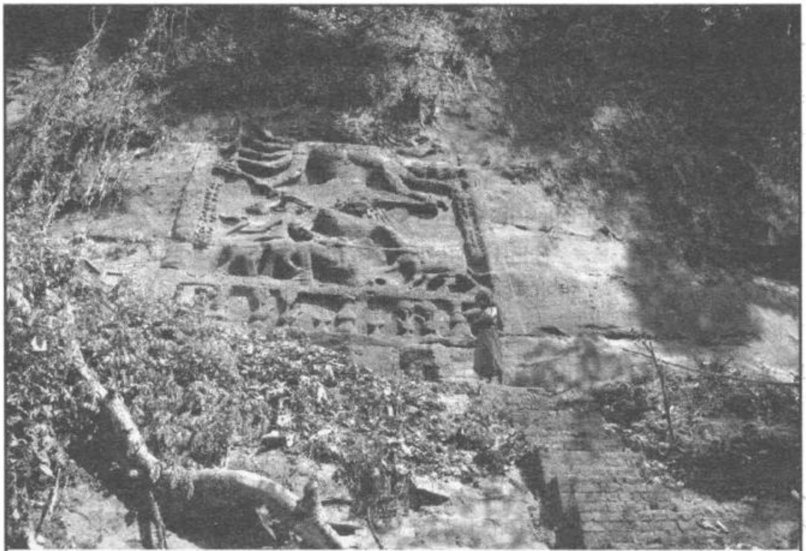

পাহাড়ের গায়ে খোদিত দুর্গামূর্তি, ছবিমুড়া *ছবি- লেখিকা*

দেশের উত্তর-পূর্ব কোণে পাহাড় জঙ্গলের আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছে কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজ্য–তারমধ্যে ত্রিপুরা একটি। আয়তন মাত্র ১০,৪৪১ বর্গকিলোমিটার। আমার জন্ম-পড়াশুনা-বেড়ে ওঠা সবই সেখানে– তাই আজ যখন বলি ত্রিপুরা বেড়াতে গেছিলাম কেমন কষ্ট হয়। কিন্তু সত্যিই তো বেড়াতেই যাই প্রতিবছর একবার কখনও দুবার। যদিও বেড়ানো খুব একটা হয় না– আত্মীয়তার আবদার রাখতে রাখতেই সময় ফুরায়। যাইহোক গতবছর কোলকাতা থেকে বেরুনোর আগেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলুম এবার দু-একটা জায়গায় ঘুরবই! সেই ছোটো বেলায় গেছিলাম ঊনকোটি পাহাড়ে– মনে আছে বিশাল সূর্যদেবতার খোদিত মুখ আর প্রস্রবণে স্নান, মনে আছে লংতরাই-এর কমলালেবুর চাষ আর মাটিতে বিছিয়ে থাকা রিঠাফলের সুগন্ধ! আজ পড়ন্ত বেলায় মিলিয়ে নিতে হবে সেই স্মৃতি সত্য কিনা। তাছাড়া দেখা হয়নি আজও নীরমহল, নতুন আবিষ্কৃত ছবিমুড়া আর পিলাক। এসব দেখতেই হবে ভেবে নিয়ে ২০১৫-র মার্চের শেষদিকে দিন দশেকের জন্য রওনা হলাম ত্রিপুরায়। কলকাতা থেকে আগরতলা যাবার সহজ উপায় আকাশপথে যাওয়া– মাত্র ৫০/৫৫ মিনিট সময় লাগে; আর আগে থেকে সুযোগ মতো টিকিট কাটলে দু-আড়াই হাজার টাকাতেই টিকিট পাওয়া যায়। যেতে যেতে পাখির চোখে দেখে নেওয়া যায় নদী মাতৃক বাংলাদেশকে। 'জল শুধু জল'– আর তারপরই চোখে পড়বে ঘনসবুজ গাছপালা, ঝকঝকে টিনের চালের বাড়ি আর ওই যে দূরে আগরতলা এয়ারপোর্ট (কিন্তু এটাই একমাত্র পথ নয়– আসাম হয়ে ট্রেনে যেমন যাওয়া যায়, তেমনি কলকাতা থেকে বাসে বাংলাদেশ হয়ে আগরতলা পৌঁছানো যায়)।

পৌঁছে দেখলাম বেশ গরম পড়ে গেছে তখন ওখানে, অবশ্য কলকাতার গরমের কাছে সেটা কিছু না। যাইহোক পরদিন বেড়িয়ে পড়লাম ছবিমুড়ার দিকে– সঙ্গে দুই দিদি জামাইবাবু আর মিষ্টু। ঠিক হল প্রথমদিন আমরা উদয়পুর থামব– রাতে সেখানে থেকে; পরদিন ভোরে ছবিমুড়ার উদ্দেশে বেরুনো যাবে। উদয়পুরের কালিবাড়ি বা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির বিখ্যাত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নাটকে। যদিও সেই গোমতির ধারে আজ আর মন্দির নেই। আগরতলা থেকে উদয়পুর যেতে খুব একটা সময় লাগে না– আর রাস্তাও সুন্দর। কিন্তু আমরা পথে সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে ঢুঁ মারলাম, দু-এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চা খেলাম তাই কিছুটা দেরি হল। প্রায় বিকেল নাগাদ উদয়পুর পৌঁছে পুরোনো ভুবনেশ্বরী মন্দির ইত্যাদি দেখে পূর্ব পরিকল্পনা মতো সন্ধ্যে নাগাদ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গেলাম। ইচ্ছে নিরিবিলিতে পুজো দেওয়া আর সন্ধ্যা আরতি দেখা (আমি যে খুব ভক্তিমতি তা নয়, কিন্তু ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের প্যাঁড়ার স্বাদ এত ভালো যে পুজো দিতেই হয়) অন্য অন্য বার দিনেরবেলায় মন্দিরে আসি, এত ভিড়ে কোনওবারই মায়ের মুখটা দেখা হয় না, এবারে ওই নির্জনতায়

সন্ধ্যের আবছায়া অন্ধকারে ধূপধুনোর গন্ধ কাঁসর ঘণ্টার শব্দের মধ্যে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আরতি দেখার অন্য অনুভূতি হল। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের লাগোয়া দীঘিতে ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছি বিশালাকৃতির মাছ আর কচ্ছপ– যা কখনও তোলা হয় না খাওয়া হয় না। ফলে ওরা নির্ভয়ে ভক্তজনের হাত থেকে খাবার খায়। এবারে দেখলাম বড়ো কচ্ছপ প্রায় নেই– দীঘির পাড় বাঁধানো হয়েছিল (সৌভাগ্য এখন তার দুটো দিক ভেঙে দিয়েছে) জলেও সম্ভবত কোনও বিষক্রিয়ার ফলে অনেক কচ্ছপ ও মাছ মারা গেছে। বন্ধুরা আশ্চর্য হবেন না মৃত মাছ-কচ্ছপও খাওয়া হয়নি, মন্দিরের পাশেই এদের সমাধি দেওয়া হয়েছে! আরতির শেষে দীঘির পাড়ে বসে মাছ-কচ্ছপকে খেতে দেওয়া গেল। সেই সঙ্গে নিজেরাও চা আর গরম গরম পকোড়া খেয়ে নিলাম। রাতটা কাটালাম সরকারি গেস্টহাউসে; বিরাট বড়ো দীঘির পাশে খোলামেলা গেস্টহাউস ভালো লাগবেই। যদিও আগে থেকে বলা না থাকায় খাওয়াটা ঠিক সুবিধের হয়নি।

সকাল আটটায় স্নান আর জলযোগ সেরে ছবিমুড়ার উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়লাম– ছবিমুড়া অমরপুর সাব-ডিভিশনে। রাস্তা খুব একটা ভালো নয়। তবে মজাদার। প্রায় লোকের উঠোন দিয়েই যেন গাড়ি চলেছে হাঁস-ছাগল-মুরগী বাঁচিয়ে...। পৌঁছানো গেল গোমতির তীরে। ছবিমুড়ায় আছে দুর্গম পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা দশভুজার মূর্তি। বহুদিন ধরেই পাহাড়ি মানুষ পুজো করে আসছে। এতদিনে তথাকথিত শহুরে মানুষদের নজরে এসেছে। জায়গাটিতে যেতে নৌকা নিতে হয়। দু-পাশের ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যদিয়ে ছুটে চলা পাহাড়ি নদী-যাত্রাটি উপভোগ্য। মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। নৌকা থেকেই ওই আশ্চর্য শিল্পকর্মটি দেখা যায়; আবার চাইলে একটু কষ্ট করলে মূর্তির কাছেও পৌঁছানো যায়। যাঁরা এই মূর্তি গড়েছেন তাঁরা তো শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না, কিন্তু অন্তরের শিল্পবোধ তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে সব দুর্গমতা-প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে পাহাড়ে ছবি আঁকতে। মূর্তিগুলি সম্ভবত ১৩০০-১৬০০ শতাব্দীর মধ্যবর্তী বলে মনে করা হয়! ফেরার পথে নৌকা থামিয়ে দেখতে গেলাম পাহাড়ি গুহা। কখনও কখনও সাধুবাবারা এসে থাকেন সেখানে– বললেন ছবিমুড়ার পূজারি সাধু। আমার অবশ্য খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য ঠেকেনি সেটা। তবে গুহার পাশের পাহাড়ি ঝোরাটি খুব সুন্দর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গোমতিতে পড়ছে। আর ইচ্ছে করলে ওই পাহাড় বেয়ে ওঠা যায় আরও ওপরে। কিন্তু জঙ্গল আর পিছল পথ বেয়ে সেই চেষ্টা আমরা আর করলাম না। বরং ফিরে চললাম উদয়পুর হয়ে আগরতলার দিকে।

পরদিন ভোর ভোর বেরুনো হল পিলাক আর মহামুনি দেখতে। পিলাকে রয়েছে বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন। উদয়পুর জেলায় গ্রামের মাঝখানে ওই প্রত্নস্থলটির অধিকাংশ নিদর্শনই চুরি হয়ে গেছে; সরকারের টনক নড়ার পর বাকিগুলি নিয়ে রাখা হয়েছে আগর-তলার মিউজিয়ামে। বিরাট এক বট-গাছের তলায় ছড়িয়ে আছে ভগ্নাবশেষ-দু-একটি মূর্তি, দেওয়ালের ভিত্তি চিত্র। ওখান থেকে বেড়িয়ে গেলাম মহামুনি, ওইটিও বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন। ফেরার পথে গাড়ি থামিয়ে পাহাড়িদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া গেল টাটকা সবজি আর সংসারের টুকিটাকি। খুব সস্তা বলে মনে হল না, কিন্তু পাহাড়ি মানুষ বা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ই বা মন্দ কী। ছবিমুড়া বা পিলাক দুটি জায়গাতেই যে অসুবিধাটি আমার খুব চোখে পড়ল তা হল টয়লেটের অসুবিধা, ছবিমুড়ায় একটা বেশ বড়োসড়ো 'পে এন্ড ইউজ' থাকলেও তা পরিষ্কার নয়, আর পিলাকে সে সবের বালাই নেই। স্থানীয় বাঙালি বা পাহাড়িরা অবশ্য যথেষ্ট সহৃদয়তার সাথে দলের মহিলাদের তাদের নিজস্ব টয়লেট ব্যবহার করতে দিয়েছেন কিন্তু আমার মনে হল এদিকে ট্যুরিজম বিভাগের নজর দেওয়া উচিত। ওইদিন বিকেলেই গেলাম ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার দেখতে। দুপাশেই বহু মানুষ জড়ো হয় আর ওই সুশৃঙ্খল ওঠাপড়ায় ফ্ল্যাগ বিনিময় দেখা চলে। যদিও সেনাবাহিনীর ওই যান্ত্রিক শৃঙ্খলতা আমার কেমন 'তাসের দেশ' নাটকের কথা মনে করায়। আমি বরং দেখছিলাম দু-পাশের দিগন্ত জোড়া ধানের ক্ষেতের মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া– মানুষ চলাচলের বাধা বটে কিন্তু পাখপাখালি উড়ে চলেছে দূর আকাশের পানে।

আগরতলা শহরটার কথাও এবার একটু বলা দরকার। ছোটো শহর কিন্তু রাস্তাঘাট যথেষ্ট পরিষ্কার-খানা-খন্দবিহীন। সম্প্রতি পরিচ্ছন্ন রাজধানী হিসেবে আগরতলা প্রথম দশটির মধ্যে এসেছে। সোজা রাস্তার দুপাশে রয়েছে গাছের ছায়া। অধিকাংশ বাড়ির লাগোয়া ছোটো বাগান। আগরতলা রাজবাড়ির একাংশে রয়েছে স্টেট মিউজিয়াম। ছোটো হলেও সুন্দর। নতুন তৈরি হয়েছে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং– দেখার মতো! শহরের মাঝখানে রবীন্দ্র-পদধূলি ধন্য উমাকান্ত একাডেমি স্কুল; তার পাশে বিরাট মাঠ আর স্টেডিয়াম শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। আছে আরও কটি স্কুল কলেজও। তারমধ্যে মহারাজা

বীরবিক্রম কলেজ বা এম বি বি কলেজ (এটি আমার নিজের কলেজও বটে) অনবদ্য। টিলার ওপরে কলেজ– নিচে রয়েছে ঝিল। যার বাঁধানো পাড়ে বসে সময় কেটে যাবে। ঝিলের একপ্রান্তে খেলার মাঠ। আমরা যখন পড়তাম তখন টিলার ধাপ কেটে বসার জায়গা করা ছিল এখন সেখানে বাঁধানো দর্শকাসন। আগরতলা বেড়াতে গেলে এই কলেজটি দেখার পরামর্শ আমি সবাইকে দেব। আগরতলা শহর পর্যন্ত এখন রেল চালু হয়েছে। পরিচ্ছন্ন স্টেশনটি দেখতে ভালো লাগে। তবে ভারতীয় রেল তো, সময়ানুবর্তিতার জন্য বিখ্যাত, এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়।

উন্নয়নের ফাঁদে শহরের অনেক সবুজ ধ্বংস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তবু যখনই কলকাতা থেকে যাই সবুজ আভা আমার চোখে যেন ঝাপটা মারে, শান্তি এনে দেয়। দু-পাশের চা-বাগান, রবার প্ল্যান্টেশন আর আদিম জঙ্গল এই ছোট্ট রাজ্যটিকে ঘিরে রেখেছে, আর রয়েছে সেখানকার মানুষের আন্তরিকতা– খুব কিছু নেই তাদের কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণতা তারা হারায়নি। পরদেশি অনাত্মীয়কেও আপন করে নিতে পারে সহজেই। আগরতলা বা ত্রিপুরার মাছের বাজারটিও খুব ভালো, মৎস্যপ্রেমীদের তা জানাই। বর্ষার পদ্মার ইলিশ তার অসাধারণ স্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। রয়েছে স্থানীয় বা বাংলাদেশের রকমারি ছোটো মাছ যার স্বাদ আমরা ভুলতে বসেছি। এখানকার আনারস সত্যিই অনবদ্য, তেমনি ভালো জাম্পুই হিলের কমলা। কাঁঠাল ফলে অজস্র– গরিব মানুষ বছরের একটা সময় ওই বিরাট আকৃতির কাঁঠাল দিয়েই পেট ভরায়। ত্রিপুরায় দেখার জায়গা রয়েছে আরও কয়েকটি। দক্ষিণের নীরমহল, কমলা- সাগর যেমন আছে তেমনই উত্তরে রয়েছে ঊনকোটি (৯০০ খ্রিস্টাব্দে)-র শিল্পকর্ম, পাহাড়ে খোদাই করা অসংখ্য মূর্তি যদিও দুর্গম জঙ্গল ভেদ করে সব দেখা কষ্টকর। আর আছে লংতরাই– জাম্পুই হিলের সূর্যোদয় অনবদ্য। রয়েছে বেশ কয়েকটি ইকোট্যুরিজমের ব্যবস্থা। প্রতিটি জায়গায় ত্রিপুরা ট্যুরিজমের গেস্টহাউস রয়েছে। তবে আগে থেকে বুকিং করা না থাকলে অসুবিধা হবে। অনেক ভ্রমণ সংস্থা এখন প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করেছে ত্রিপুরায়। সেসব নিলে নিশ্চিন্তে ঘোরা যাবে সত্য, কিন্তু কেউ যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেতে চান তাহলেও অসুবিধা হবে না। আগরতলায় বেশ কটি ভালো হোটেল আছে, যা নেটেও বুক করা যায়। তবে এও সত্য আমার জন্মভূমিতে উত্তুঙ্গ পাহাড় নেই, অশান্ত সাগরবেলা নেই, দুর্গম অরণ্যের স্বাদও সেখানে পাবেন না। পাবেন একটি আদিম জনজাতির কৃষ্টির নিদর্শন, নিরাভরণ প্রকৃতির সৌন্দর্য আর সাধারণ মানুষের সহজ সারল্য।

আরও মনে রাখবেন ইংরেজ শাসনকালেও ত্রিপুরাই ছিল একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজভাষা ছিল বাংলা। বাংলায় লেখা হয়েছিল রাজমালা। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রিপুরার রাজাদের বদান্যতা ছিল অফুরান। স্বাধীনতার পরেও আশির দশকের জাতি-উপজাতির দাঙ্গা ছাড়া আর কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সেখানে হয়নি। ত্রিপুরা ছিল রবীন্দ্র স্নেহধন্য– আর তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কবি হিসাবে যখন তিনি গণ্যই ছিলেন না, সেই দূর শৈশবেই তাঁর ভবিষ্যত কবিপ্রতিভাকে অনুভব করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে পাঠিয়ে সে বার্তা জানিয়েছিলেন তরুণ কবিকে। অভিভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বীরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এক অসমবয়সী সখ্যতা তৈরি হয়েছিল। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর মাণিক্য হয়ে উঠেছিলেন কবির সমবয়সী বন্ধু। বিপদে-সম্পদে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি নাইটহুড ত্যাগের পর যখন বিদেশে কবি নিন্দিত, স্বদেশের মানুষ বা রাজারাজড়ারা তাঁর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছে সযতনে, তখনও ত্রিপুরায় তিনি পেয়েছেন আন্তরিক আতিথ্য- সম্মান ও শান্তি। ছোট্ট করদ রাজ্যটি বিদেশি শাসকের ভয়ে সাহিত্যের রাজাধিরাজকে আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেনি। শুধু তাই নয় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ও ছিল ইংরেজ শাসকদের সন্দেহের তালিকাভুক্ত। কিন্তু ত্রিপুরার রাজারা তাঁদের যৎসামান্য রাজভাণ্ডার থেকেই অর্থ সাহায্য করেছে সেখানে, কখনও ছাত্র পাঠিয়েছে, কখনওবা শিক্ষক। বিজ্ঞান ভবন বা হাসপাতাল তৈরিতে এককালীন অর্থ সাহায্য তো আছেই। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুত্ব আর স্নেহস্পর্শ রেখেছে সেখানে। আর লিখেছেন অসামান্য তিনটি সাহিত্যসম্ভার– মুকুট (গল্প), রাজর্ষি (উপন্যাস) এবং বিসর্জন (নাটক)। এখনও ত্রিপুরায় রবীন্দ্রচর্চা ঈর্ষণীয় সুনামের সঙ্গে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও রাজারা বাংলা-দেশের আরও অনেক গুণীজনকে সম্মানিত করেছেন– দীনেশচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসুর নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আমার কাছে সেগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ত্রিপুরায় বর্ষা আসে জোরালোভাবে, গরমও মন্দ নয়। বেড়ানোর জন্য আদর্শ সময় তাই শীতকাল। তাহলে এবারের শীতটা ত্রিপুরার জন্যই থাকুক।

ড. তপতী বর্মণ

অধ্যাপিকা। নেশা লেখালেখি। ভ্রমণ বিষয়ক ও শিশু সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহ।

অম্বিকা কালনা

অসিত তা

১০৮ শিবমন্দির, কালনা ছবি- লেখক

"দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।/দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।" কবির এই অনুভব যে কত বাস্তব তা বাড়ির আশেপাশে একবার তাকালেই বোঝা যায়। প্রচারের আলোকে আসেনি অথচ অতীতের মণি-মাণিক্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার নাগালের মধ্যে। বাংলার প্রতিটি জনপদ আপন মাধুর্যের উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল। প্রয়োজন শুধু অনুভবের দৃষ্টিভঙ্গি। একবেলা, একদিন, বা একরাত্রি-একদিনের মধ্যে ভ্রমণের স্বাদ নেওয়া। কোথাও ইতিহাসকে স্পর্শ করা বা স্থাপত্যকে দুচোখ ভরে দেখার মতো সম্পদের ছড়াছড়ি আমাদের নাগালের মধ্যে। এমনই এক অতীত ঐতিহ্যের স্পর্শ পেতে চলেছি অম্বিকা কালনা।

হাওড়া বর্ধমান মেনলাইনে ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে কাটোয়াগামী ট্রেন ধরে ১ঘণ্টা ১৫ মিনিট পরে নেমেছি অম্বিকা কালনা স্টেশনে। বেশ ছিমছাম সুন্দর স্টেশন। বেশ বড়ো বোর্ড দিয়ে রাখা আছে স্টেশনে– 'মন্দিরময় কালনা আপনাকে স্বাগত জানায়'। স্টেশনের বাইরে বেড়িয়ে রিকশা, অটো, টোটো সবই আছে। আমরা টোটো ধরলাম, যাব রাজবাড়ি চত্বর।

বর্ধমান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত এই প্রাচীন জনপদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এই ছোটো শহর অতীতের বন্দর ও বাণিজ্য

নগরী হিসাবেও পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্তযুগে কালনা বন্দর হিসেবে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। তবে অধুনা কালনার শিল্পসমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি সবই বর্ধমান রাজবংশের ছোঁয়ায়। ১৭৫২ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে কালনায় প্রায় উনিশটি মন্দির স্থাপিত হয়। যার স্থাপত্য ভাস্কর্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে। মন্দিরগুলির মধ্যে তাদের সৌন্দর্যবোধ ও রুচিরও পরিচয় মেলে। অম্বিকা কালনা নামটি নিয়েও কিছু প্রবাদ প্রচলিত আছে। ৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঋষি অম্বরীশ প্রতিষ্ঠা করেন সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। নাম হয়ে যায় অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী। আজও মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও বর্তমান। প্রচলিত যে অতীতে এ স্থানের নাম অম্বিকাই ছিল। পরে কালনা যোগ হয়েছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই টোটো রাজ বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল। সেই অর্থে বর্তমানে রাজবাড়ি নেই। কারণ রাজবংশের উত্তর পুরুষরা পরবর্তীতে কালনার প্রায় সব বাড়ি ও অংশ বিক্রি করে দিয়েছেন। ফলে বেশির ভাগ অংশই বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। তাই রাজমহল থাকলেও তা বর্তমানে ব্যক্তিগত বাড়িতে পরিণত। তবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সময় মতো হস্তক্ষেপ করায় মন্দিরগুলি তাদের দখলে চলে আসে ও এইসব অমূল্য স্থাপত্য রক্ষা পায়। বর্তমানে অবশ্য সব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ তারাই করে। টোটো থেকে নেমে রাস্তার বামদিকে দৃষ্টি যেতেই এক ঝলকে অনেকগুলি মন্দির চোখে পড়ল।

গেট পার করলেই বামদিকে দণ্ডায়মান, প্রায় সারা শরীর অপূর্ব টেরাকোটার কাজে সমৃদ্ধ প্রতাপেশ্বর মন্দির; যদিও সেই টেরাকোটার জৌলুষ অনেকটাই ম্লান। তবুও ঊনবিংশ শতকের তৈরি উঁচু ভিত্তির উপর অবস্থিত এই 'রেখ দেউল'টি আনুমানিক ১৮৪৯ সালে নির্মিত। অনেকখানি ম্লান হয়ে গেলেও আজও তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। অনেকক্ষণ চোখ ফেরানো যায় না।

ঠিক ডান পাশেই ছাদহীন রাসমঞ্চ। ছাদ না থাকার তথ্য জানা গেল না, তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছাদ ধ্বংস হয়ে গেছে ধরেই নেওয়া যায়। ইটের তৈরি বহুভুজাকৃতি মঞ্চটির গঠনশৈলী অনবদ্য। আজও রাস উৎসব উপলক্ষে মঞ্চটি সাজিয়ে তোলা হয়।

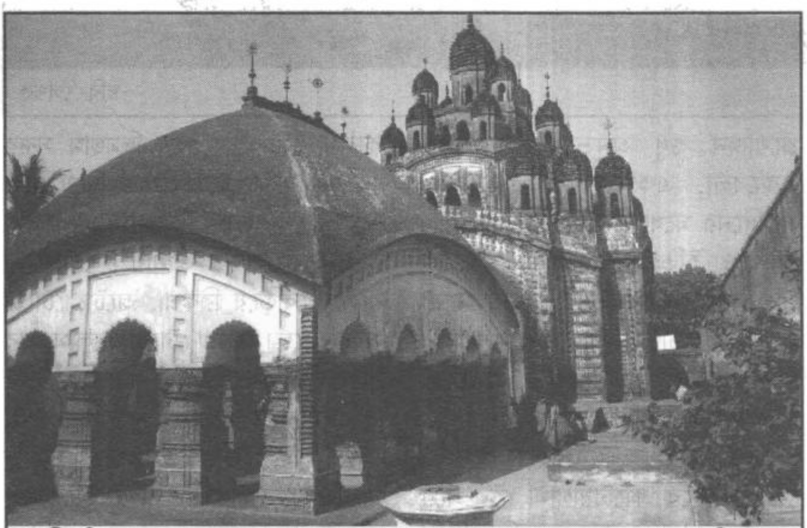
লালজী মন্দির, কালনা ছবি- লেখক

রাসমঞ্চকে বাঁদিকে রেখে দু-কদম এগালেই ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি পঁচিশ চূড়া-যুক্ত লালজী মন্দির প্রাঙ্গণ। এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তাই গেট পার হলেই সামনে মন্দিরের চাতাল। অপূর্ব টেরাকোটা কাজের অলংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরটি। এত সুন্দর টেরাকোটার কাজ বাংলায় আর কোনও মন্দিরে আছে বলে জানা নেই। ওখানেই জানলাম মন্দিরের এক একটি চূড়াকে রত্ন বলা হয়, যা মন্দিরের আভিজাত্যের লক্ষণ। পঞ্চবিংশতিতম রত্নমন্দিরও সেই অর্থে বাংলায় কম আছে। এই মন্দিরে নিয়মিত পূজা পাঠ আজও চলে। এই একই চৌহদ্দির প্রবেশ পথের ঠিক বামদিকে পাহাড়ের আদলে নির্মিত আর এক অনন্যসুন্দর 'গিরি গোবর্ধন' মন্দির। অপূর্ব কাজের মিশেলে তৈরি এত সুন্দর মন্দির খুব কম দেখা যায়। অন্তত বাংলায় আর আছে বলে জানা নেই। দুই মন্দিরের বাম পাশে একটা ছোটো মন্দির যাতে আজও ১০৮টি শালগ্রাম শিলা স্থাপিত ও নিয়মিত পূজা পাঠ হয়।

ঠিক ডান পাশে আরও একটি ২৫ রত্নমন্দিব-চূড়া চোখে পড়বে। কিন্তু যাত্রা পথেই ১৯ শতকে তৈরি পাঁচটি ছোটো মন্দির চোখে পড়বে যা পঞ্চরত্ন মন্দির নামে পরিচিত।

১৭৫১-৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি কৃষ্ণচন্দ্রজী মন্দিরটিও এক অনন্য স্থাপত্যের নিদর্শন। কিন্তু গঠনশৈলী ও টেরাকোটার কাজ প্রায় একই 'লালজী' মন্দিরের মতো। তবে চারচালা বা চাতাল না থাকায় তার অপূর্ব শৈলী যেন আরও ফুটে উঠেছে। খুব নিকট থেকে টেরাকোটা কাজ আরও নিখুঁতভাবে দেখা যায়। পঞ্চবিংশতি রত্ন সমৃদ্ধ মন্দিরটির সৌন্দর্য বর্ণনা করার মতো ভাষা জানা নেই। ঠিক পিছন দিকে পোড়া মাটির ফলক লাগানো আর একটি

মন্দির আছে, নাম বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির। তবে মনে রাখা দরকার যে, মন্দির সংলগ্ন এলাকা দুপুর দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

ঠিক যে রাস্তায় টোটো থেকে নেমেছিলাম তার বাম পাশে এই মন্দিরচত্বর দেখা শেষ করে চলেছি ডান পাশের ১০৮ শিব মন্দির দেখতে। এখানেও সমগ্র মন্দির এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গেটে পা রাখলেই চোখে পড়বে একই মাপ ও একই উচ্চতার আটচালা মন্দিরের বৃত্তাকার সারি। বাইরে ঝোলানো বোর্ড থেকে জানা গেল ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর মন্দিরগুলি তৈরি করান। দুটি বৃত্তাকার সারিতে বিন্যস্ত মন্দিরগুলি ইটের তৈরি। বাইরের বৃত্তে ৭২টি ও ভিতরের বৃত্তে ৩৬টি মন্দির আছে। অর্থাৎ জ্যামিতির ১২-র গুণিতক মাপে প্রথম ও দ্বিতীয় বৃত্ত তৈরি হয়েছে। ভিতরের বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহদাকার কূপ। অনুমান করাই যায় যে, পূজার কাজের জল এখান থেকেই নেওয়া হত। কোথাও শ্বেতপাথর কোথাও কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ মন্দিরগুলিতে অবস্থিত। নিখুঁত মাপ, সাইজ ও বৃত্তাকারে অবস্থিত হওয়ায় অবশ্যই এক দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য তা স্বীকার করতেই হবে।

এছাড়াও আরও কিছু মন্দির ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কালনা শহরে। যেমন— গোপালবাড়ি মন্দির, জগন্নাথ মন্দির এবং অবশ্যই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। রিকশা সহযোগে একঘণ্টার মধ্যেই মন্দিরগুলি ঘুরে নেওয়া যায়।

মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যটকের কাছেই শুনলাম যে সোমড়া বাজার-এর 'মিত্র মুস্তাফী পরিবারের' তৈরি করা এমনই এক ২৫ রত্নমন্দির আছে। শুনেই পাশেই থাকা সোমড়া বাজার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

ট্রেন পথে অম্বিকা কালনা থেকে হাওড়া মুখে ঠিক দুটি স্টেশন পরেই সোমড়া বাজার স্টেশন। হাতে সময় কম, স্টেশনের পাশেই রেল গেট থেকে টোটো চেপে বসি। চুক্তি এটাই যে সোমড়া বাজারের মন্দির তথা দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখাবে। বেশ মিষ্টিভাষী যুবক। প্রথমেই নিয়ে গেল আনন্দময়ী মন্দির।

বেশ প্রাচীন স্থাপত্য। যথারীতি টেরাকোটা সমৃদ্ধ। তবে প্রাচীনত্বের কারণে ক্ষয়িষ্ণু। গঠনশৈলী চমৎকার। মূল মন্দিরকে কেন্দ্র করে দুপাশে ছয়টি করে মন্দিরের সারি। ইতিহাস জানা না গেলেও একথা জানা গেল যে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির এই মন্দিরের আদলে তৈরি।

হরসুন্দরী মিত্র মুস্তাফী মন্দির-এলাকার গেট বন্ধ। বাইরে থেকে এক ঝলক দেখা। কিন্তু ঠিক মন ভরলো কই? ২৫ রত্নমন্দির তো নেই! কিন্তু অনেকটাই আনন্দময়ী মন্দিরের অনুকরণে। অনেক ঐতিহ্যবাহী পরিবার প্রাচীনত্বের দাবি নিয়েই গ্রামের একপ্রান্তে বেশ সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত। পাশেই একটি অনাথ আশ্রম।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের অবস্থান অসাধারণ এক পরিবেশে। তার সাথে বিশাল বটবৃক্ষ তার প্রাচীনত্বের দাবির সাক্ষ্য হিসাবে যেন দাঁড়িয়ে আছে তার আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

অম্বিকা কালনা ও সোমড়া বাজার ঘুরতে ঘুরতে বারে বারে মনে হয়েছে এই অমূল্য সম্পদগুলি কেন তুচ্ছ হয়ে পড়ে আছে? তা কি কেবলই প্রচারের অভাবে? অথচ এদের স্থাপত্যশৈলী বিশেষত কালনা শহরে যা আছে তা প্রচারবহুল অনেক সুদূরের আহ্বানকেও হার মানিয়ে দেবে— মন্দিরগুলির কাঠামোগত গুণ বিচারে। অনিন্দ্যসুন্দর টেরাকোটার কাজের কাছে বিষ্ণুপুরও বোধহয় ম্লান— অন্তত আমার বিচারে। মন্দিরের কোণগুলি আরও প্রায় দশ ইঞ্চি বৃদ্ধি পেয়েছে টেরাকোটার কাজের উপর দাঁড়িয়ে— এ দৃশ্য বোধহয় বিরলতম। অথচ শাক্ত ও বৈষ্ণব তীর্থ এই সুন্দর মন্দিরগুলি দর্শকের কাছে আজও অধরা— এই বেদনা নিয়েই বাড়ি ফিরছি।

পথনির্দেশ—

অম্বিকা কালনা রেল ও সড়ক দুভাবেই যেতে পারেন। শিয়ালদা, হাওড়া বা কলকাতা থেকে কাটোয়াগামী লোকাল ট্রেনে অম্বিকা কালনা স্টেশন। ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন পাওয়া যায়। কমবেশি দেড় ঘণ্টার পথ। এছাড়া কামরূপ এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, রাধিকাপুর এক্সপ্রেস বা হাওড়া-মালদা ইন্টারসিটি ধরেও যেতে পারেন। সবকটি ট্রেনই অম্বিকা কালনা স্টেশনে থামে।

সড়ক পথে জিটি রোড ধরে আদিসপ্তগ্রাম মোড় ও সেখান থেকে সোজা অম্বিকা কালনা।

থাকার জন্য—

কালনা পুরসভার গেস্টহাউস 'পান্থনীড়' (০৩৪৫৪-২৫৫৫৩২) সবচেয়ে ভালো জায়গা। ব্যবস্থা ভালো। সাধ্যের মধ্যেই নানারকমের ঘর। মহকুমা শহর হওয়ায় আরও কয়েকটি বেসরকারি হোটেলও আছে। উল্লেখযোগ্য হোটেল প্রিয়দর্শিনী (০৩৪৫৪-২৫৫৬১৪)।

অসিত তা

অবসরপ্রাপ্ত। ভ্রমণের নেশা আর ইতিহাস খোঁজায় ভাঁটা পড়েনি। ডাইরির পাতায় লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন নিয়মিত।

বীরভূমের পঞ্চপীঠে ভ্রমণ

শক্তিপদ ভট্টাচার্য

সতীর দেহত্যাগের পর তাঁর দেহাংশ ৫১ ভাগে বিভক্ত হয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়ে ৫১ পীঠের সৃষ্টি হয়েছে। বীরভূম জেলায় পাঁচটি জায়গায় পতিত হয়ে পঞ্চপীঠের সৃষ্টি। নলহাটিতে দেবী ললাটেশ্বরী, সাঁইথিয়ায় দেবী নন্দীকেশ্বরী, লাভপুরে দেবী ফুল্লরা, বক্রেশ্বরে দেবী মহিষমর্দিনী ও কঙ্কালীতলায় দেবী কঙ্কালী। অনেকে তারাপীঠকে একান্ন পীঠের এক পীঠ মনে করলেও ধারনাটি সঠিক নয়। এটি একটি সিদ্ধপীঠ। যে সব তীর্থে সতীদেবীর কোনও দিব্য অংশ পতিত হয়নি কিন্তু মহান সাধকগণ ওই তীর্থভূমিতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, সেই তীর্থকে জাগ্রত করে তুলেছেন, সেই পুণ্যভূমি সিদ্ধপীঠ রূপে স্বীকৃত হয়। একান্ন শক্তিপীঠের মধ্যে এগারোটি পীঠ বিরাজ করছে পশ্চিমবঙ্গে।

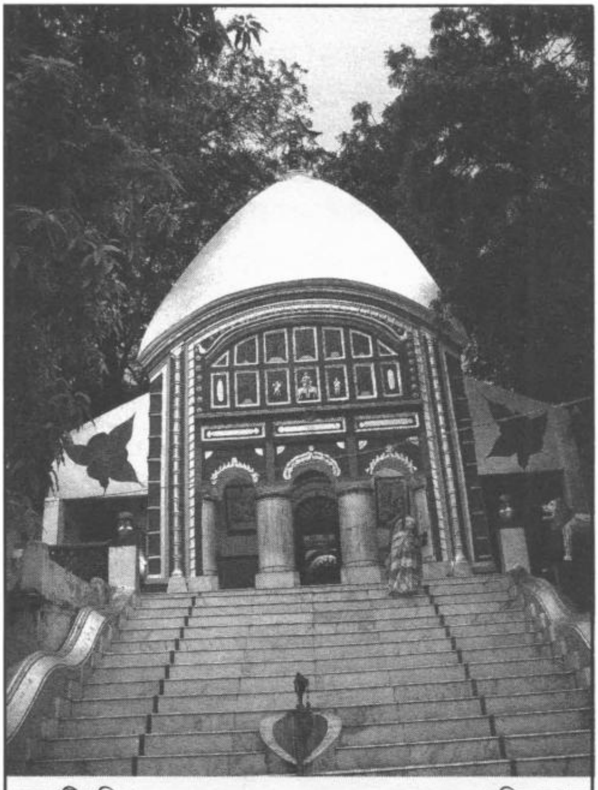

নলহাটি মন্দির ছবি- লেখক

একদিন এক অলস সকালবেলা ব্যাণ্ডেল থেকে গণদেবতা এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। গাড়িটা হাওড়ায় গঙ্গার ধার থেকে ছেড়ে মাঠ-ঘাট-নদী-নালা পেরিয়ে আজিমগঞ্জে একদম ঠিক গঙ্গার পাশে দাঁড়ায়। তারপর একটু খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিয়ে আবার হাওড়ায় ফিরে আসে। সকালে এই গাড়িতে চেপে রাতে ফিরে আসলে একটা আস্ত মস্ত ভ্রমণ হয়ে যায় গাড়িতে বসে। শনি, মঙ্গল বা অমাবস্যায় গাড়িটা একটু ফাজিল হলেও অন্যদিন শান্ত থাকে। বীরভূমের প্রায় সীমান্তে পূর্ব রেলের জংশন স্টেশনে আমায় নামিয়ে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল।

নলহাটি একটি প্রাচীন গঞ্জ। আয়ুর্বেদ থেকে কৃষি, সবেতেই সেরা। তবে নলহাটির প্রসিদ্ধি দেবী ললাটেশ্বরীর জন্য। স্টেশনের দক্ষিণ গা ঘেঁষে পুব দিক থেকে পশ্চিমে যে পাকা রাস্তাটা বাজারের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে সেই পথে প্রায় একমাইল দূরে একটি ছোটো টিলা। টিলার ঢালে দেবী পার্বতী অর্থাৎ ললাটেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড়টি বিস্তৃত। লালরঙের ১৩টি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে দেবীর সাক্ষাৎ মেলে। সিঁড়িপথের মুখে ভৈরব যোগেশের অবস্থান। মন্দিরের ঈশান কোণে রাস্তার ধারে একটি শিবমন্দিরে রক্ষিত কয়েকটি ভাঙা শিলাখণ্ডকে কেউ কেউ দেবীর ভৈরব বলে থাকেন। ভিন্ন মতে, মন্দিরের ২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে হরিটোকা গ্রামের শিবলিঙ্গটি নাকি আসল ভৈরব যোগেশ।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ডমরু আকৃতির বেদির উপর সম্পূর্ণ সিঁদুরে লিপ্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক বড়ো পাথরের খণ্ডে সোনার চোখ-নাক বসিয়ে দেবীর মুখের আদল দেওয়া হয়েছে। ইনিই দেবী ললাটেশ্বরী। পীঠমালা মহাতন্ত্র অনুযায়ী বলা যায়, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর দেহাংশ-নলা পড়েছিল এখানে। নলা অর্থাৎ নুলো অর্থাৎ কনুইয়ের নিম্নভাগ, সংস্কৃত 'নলক' শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লম্বা অস্থি। দেবীর নাম কালিকা আর ভৈরব যোগেশ। কারুর কারুর মতে দেবীর ললাট পড়েছিল এখানে বলে ললাটেশ্বরী, অথবা নলহাটেশ্বরী থেকেও ললাটেশ্বরী হতে পারে। মতান্তরে নল রাজাদের রাজধানী থেকেই নলহাটির নামকরণ। আবার কেউ বলেন, এখানে সতীর

কণ্ঠনালী পড়েছিল। শাস্ত্রে দেবীর যে নামই উল্লেখ থাকুক না কেন, স্থানীয় মানুষদের কাছে তিনি দেবী ললাটেশ্বরী নামে বন্দিতা।

প্রতিদিন ভোরবেলা দেবীকে যখন স্নান করানো হয় তখন বেদির অভ্যন্তরে রাখা নলার দর্শন পাওয়া যায়। দেবীমূর্তির ডানদিকে রয়েছে নারায়ণ শিলা। প্রথমে নারায়ণকে পুজো করে তারপর দেবীর পুজো আরম্ভ হয়। শাক্তপীঠে নারায়ণ শিলার অবস্থান অবাক করলেও কৌতূহল নিরসিত হয় পুরোহিতের উত্তরে। প্রাচীনকাল থেকেই নলহাটিতে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম পাশাপাশি বিরাজ করছিল। নলহাটির মাত্র কয়েক মাইল পশ্চিমে রয়েছে দুটি প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থ নাথপাহাড় ও হরিটোকা গ্রাম। নাথপাহাড়ে রাজা উদয়নারায়ণ গিরি গোবর্ধনধারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ললাটেশ্বরী মন্দিরও রাজা উদয়নারায়ণের রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। রাজা বৈষ্ণব হয়েও দেবীর পূজার জন্য বহু জমি দেবোত্তর হিসেবে দান করেন। যোগেশের মন্দিরের ভিত খোঁড়ার সময় শিবলিঙ্গের পাশে নারায়ণের পদচিহ্ন সম্বলিত একখানা পাথর পাওয়া যায়। সেই ঘটনাটি দৈব নির্দেশ ধরে নিয়ে দেবীর পুজোর আগে নারায়ণকে পুজো করার রীতি চালু হয়েছে।

পাহাড়ের গায়ে গাছপালায় ছাওয়া বর্তমানে সুউচ্চ চারচালা মন্দিরটি সত্যি দর্শনীয়। একটি ধর্মশালা রয়েছে। মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত পিতলের কলসিগুলি দূর থেকে চোখে পড়ে। বর্তমান মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা কে– তা নিয়ে বহু মত প্রচলিত। প্রথম মত অনুযায়ী, পশ্চিম নুনিয়ার বেনিয়া জনৈক সিকদার (সাহা) এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় মতে, বর্গীর হাঙ্গামা দমনের উদ্দেশ্যে বাংলার নবাব একজন সুবেদারকে এই অঞ্চলে পাঠান। তিনি নলহাটির টিলার উপর ছাউনি ফেলেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি মন্দির করে দেন। পরবর্তীকালে অনেকে এই মন্দিরের সংস্কার করেন। এদের মধ্যে নাটোরের রানি ভবানীর নাম প্রসিদ্ধ। তিনি রাজধানী বড়নগর থেকে ব্রাহ্মণী নদী বেয়ে বৈদ্যনাথধামে তীর্থ করতে যাওয়ার পথে নলহাটির ঘাটে একরাত থেমেছিলেন। আরতির শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি দেবীর মন্দিরে আসেন। মন্দির সংস্কারের জন্য প্রচুর টাকা ও তিনশো বিঘা জমি দেবোত্তর করে দেন। আরও পরে নসীপুরের কুখ্যাত রাজা দেবী সিংহ এই অঞ্চলের জমিদারি কেনায় মন্দিরসহ সমস্ত ভূসম্পত্তি তাঁর জমিদারির আওতায় আসে। নসীপুরের রাজারা বংশানুক্রমে মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করার পর তাঁদের জমিদারি কোর্টস অব ওয়ার্কস-এর হাতে যায়। সেখান থেকে সেবা পুজোর অর্থ আসত। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর বর্তমানে স্থানীয় মানুষদের গড়া কমিটি মন্দির দেখাশোনা করে। মন্দির এলাকার বাইরে উত্তরদিকে একটি পঞ্চমুণ্ডির আশ্রম আছে। জনশ্রুতি, ওই পঞ্চমুণ্ডির আসনে নাটোরের রানি ভবানীর জামাতা রামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনা করেছিলেন।

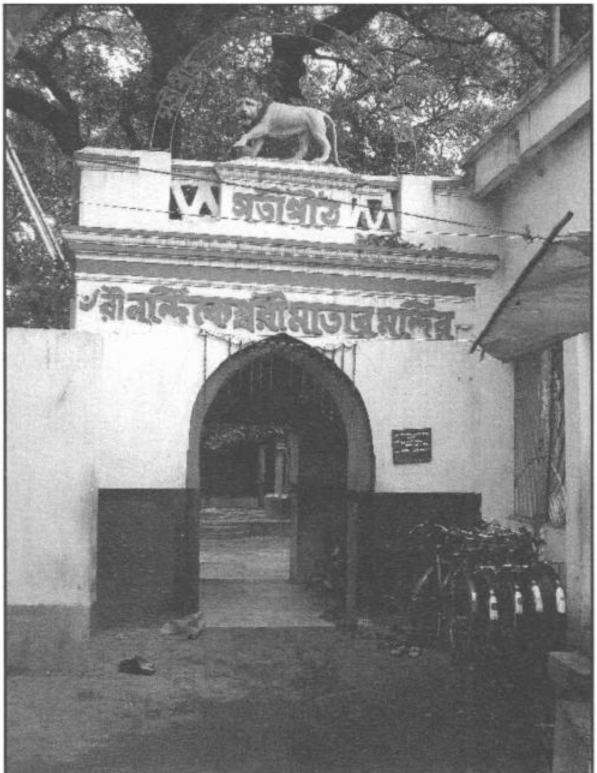

সতীপীঠ, সাঁইথিয়া ছবি- লেখক

নিত্যপুজো ব্যতীত প্রতি বছর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী কার্তিকী অমাবস্যায়, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পুজোয়, চৈত্র মাসে বাসন্তী পুজোয় এবং আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে দেবীর সার্বজনীন ভোগপুজো ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নলহাটিতে প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

দুপুরে খাওয়ার পর স্টেশন চত্বরে চলে এলাম। ফাঁকা স্টেশন, একটু বিশ্রাম নেওয়ার আদর্শ জায়গা। বিকালে ফিরতি পথে এলাম সাঁইথিয়া, অনেক স্মৃতি বিজড়িত। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-র শেষপর্বে কমললতা এই সাঁইথিয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে পাড়ি দিয়েছিলেন। আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য কমপয়সায় নন্দীকেশ্বরী মন্দিরের যাত্রীনিবাসে থাকা যাবে আর এখান থেকে বক্রেশ্বর ও লাভপুর যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে। সাঁইথিয়ায় এখন অনেক লজ, থাকার কোনও অসুবিধা নেই।

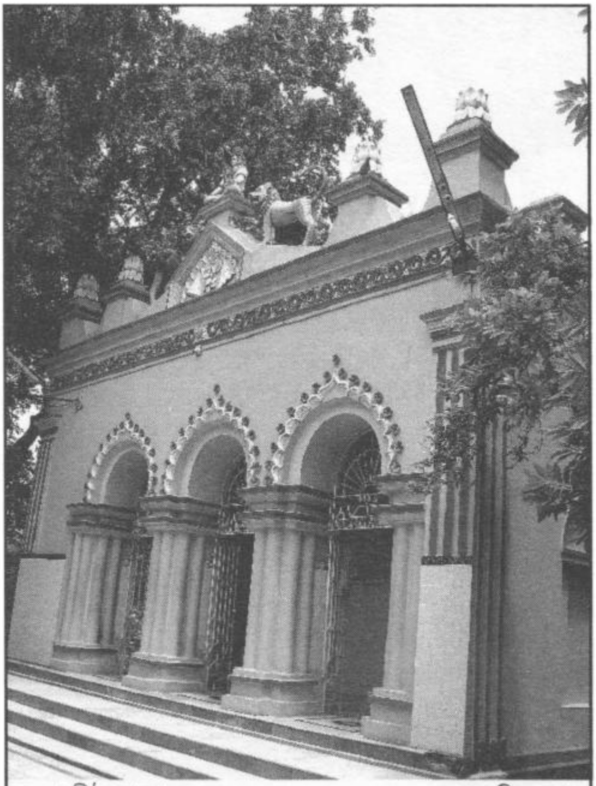

ফুল্লরা পীঠ, লাভপুর ছবি- লেখক

স্টেশন চত্বর পেরতেই দেবী নন্দীকেশ্বরী মন্দির। পীঠ নির্ণয়তন্ত্র অনুসারে সতীর কণ্ঠের হাড় পড়ে অতীতের নন্দীপুরে অর্থাৎ আজকের সাঁইথিয়ায়। মন্দিরটি একটি পাঁচিল ঘেরা জায়গার মধ্যে অবস্থিত। ১৩১০ বঙ্গাব্দের তৈরি মন্দিরের অঙ্গনটি পাথরের টালিতে বাঁধানো। সুবিশাল প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ গাছ। এই দুটি গাছের বাঁধানো বেদির প্রকোষ্ঠে তেল-সিঁদুরে চর্চিত ত্রিকোণ এক শিলাখণ্ডই দেবীর প্রতিভূ। এই শিলাখণ্ডের উপর রুপোর নাক-চোখ-মুখ বসানো। রেলিং ঘেরা ছোটো মন্দির, ছাদ আচ্ছাদিত। দেবীর ভৈরব নন্দীকেশ্বর। ছায়াচ্ছন্ন বটবৃক্ষতলে নন্দীকেশ্বর ভৈরবের মন্দির। নানান দেবতা যেমন কালীয়দমন মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ, শীতলা, গণেশ, গৌরী এখানে রয়েছেন। মূল পুজো বিপদতারিণী পুজোর সময় হয়। এছাড়া শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে মন্দিরের বরণীয় উৎসব। রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে। নন্দীকেশ্বরী মন্দিরের পাশেই জগন্নাথ মন্দির, তাদেরই উৎসব রথযাত্রা। প্রতিটি পালাপার্বণ ছাড়াও অসংখ্য তীর্থযাত্রীর আনাগোনা লেগেই থাকে। নিত্যভোগের আয়োজনে নিরামিষ ভোগই প্রধান। মন্দিরের ধ্যানগম্ভীর কলুষহীন পবিত্র পরিবেশ মনকে অনায়াসে ছুঁয়ে যায়।

খুব সকালে ঝোলা কাঁধে বাসস্ট্যান্ডে এসে তাড়াতাড়ি বক্রেশ্বর যাওয়ার জন্য সিউড়ি বাসে এসে এখান থেকে বক্রেশ্বরে যাওয়ার জন্য বাস ধরলাম। শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদের মিলনক্ষেত্র বক্রেশ্বর যেমন একদিকে বক্রনাথ শিব ও মহিষমর্দিনী দেবীর জন্য বিখ্যাত, আবার অন্যদিকে উষ্ণজলের সতত প্রবাহিত প্রস্রবণের জন্য তার খ্যাতি। বক্রেশ্বর এক অনাবিল আনন্দের কেন্দ্র। দুই পবিত্র নদী বরুণা ও অসি দ্বারা যেমন বারাণসী বেষ্টিত, তেমনই পাপহরা ও বক্রেশ্বর নামে দুই পুণ্যতোয়ার মাঝে মহাতীর্থ বক্রেশ্বর অবস্থিত। কুণ্ডগুলি ছেড়ে কয়েক পা এগোলেই বক্রেশ্বরনাথের মন্দির। বক্রনাথ শিবকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বিভিন্ন আকারের অসংখ্য শিবমন্দির আছে। একস্থানে একত্রে এত ছোটো, বড়ো, মাঝারি শিব মন্দিরের সমাবেশ পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এত মন্দিরের সমাবেশ দেখে সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ বক্রেশ্বরকে 'দেবতাদের গ্রাম' বলে উল্লেখ করেছেন।

বক্রেশ্বরনাথ মন্দিরের ডানদিকে হল দশভুজা মহিষমর্দিনীর মন্দির, মূর্তিটি ছোটো এবং পিতলের। একান্ন পীঠের মধ্যে বক্রেশ্বর একটি মহাপীঠ। এই পীঠস্থানের উল্লেখ আছে পীঠমালা, কালিকাপুরাণ এবং তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে–

"বক্রেশ্বরে মনঃপাত বক্রনাথস্থ ভৈরবঃ
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দিনী।"

বক্রেশ্বরে পড়েছে সতীর ভ্রু-সন্ধি বা মনঃস্থান। মহামায়া সতী এখানে মহিষমর্দিনী নামে বিরাজিতা, ভৈরব বক্রনাথ। মন্দিরটি অত্যন্ত সাধারণ। অনেকেই মনে করেন এই মূর্তি প্রকৃত পীঠদেবী নয়, কারণ সমস্ত পীঠস্থানে দেবী-অঙ্গ বা দেবীমূর্তি বলে যে প্রতীককে তুলে ধরা হয় তা প্রস্তরীভূত। তবে জনশ্রুতি, কালাপাহাড়ের আক্রমণের সময় পূজারীরা আসল পাথরের মূর্তিটিকে পুকুরের জলে ফেলে দেন। পরে বিগ্রহটি তুলে পাশের গ্রাম ডিহি বক্রেশ্বরে নিয়ে যান কারণ ততদিনে বক্রেশ্বরের ধাতুমূর্তিটি স্থাপিত হয়ে গেছে।

বক্রেশ্বর থেকে সিউড়ি হয়ে চললাম লাভপুরে। বোলপুর থেকে নানুর কীর্ণাহার হয়ে লাভপুর আসা যায়। এখান থেকে এক কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে ফুল্লরা পীঠ। দেবীর অপর নাম অট্টহাস। 'অট্টহাসে চ ফুল্লরা'। এই পীঠ জনবসতি থেকে দূরে অত্যন্ত মনোরম স্থানে অবস্থিত। লাল কাঁকুড়ে মাটির টিলার ওপর পীঠভূমি। নীচে প্রবাহিত উত্তরমুখী কোপাই নদী। পাশেই রয়েছে মহাশ্মশান। পীঠের প্রবেশতোরণ অসাধারণ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের লাগাতার বিশেষ প্রকল্প থেকে গভীর নলকূপের জল সরাসরি পীঠস্থানে সরবরাহ করা হয়। ভক্তদের সুবিধা হয়েছে তাতে।

পীঠের পরিবেশ গাছপালার ছাওয়ায় পরিবেষ্টিত এবং বেশ সাজানো গোছানো। মূল মন্দিরের সামনে বিরাট মঞ্চ। মন্দিরে

সমতল ছাদের কার্নিশে সিমেন্টের কাজে ধ্যানরত মহাদেব। নাটমন্দিরের মেঝেতে টাইলস বসানো। মন্দিরে প্রাচীনত্বের কোনও ছাপ নেই। সামনে দুটো শিবমন্দির, মাঝ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে বিরাট এক দিঘিতে। প্রবাদ আছে, দিঘির জল কোনওদিন শুকোয় না। দিঘির নাম দেবীদহ বা দলদলি। এই দিঘি ঘিরে আরও জনশ্রুতি রয়েছে যে, অকালবোধনের সময় হনুমান নাকি এই দিঘি থেকে ১০৮টি নীলপদ্ম সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য। শিবমন্দিরের গায়ে ১৩০২ বঙ্গাব্দের একটি ফলক রয়েছে। ওই ফলকটিই প্রাচীনতম বলে মনে হয়। স্থানীয় জমিদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। শিবমন্দির দুটির মাথায় সিমেন্টের কাজে শিবস্কন্ধে সতী এলিয়ে পড়েছেন, তার মধ্য দিয়ে সতীপীঠ সৃষ্টির বীজ উপাখ্যান চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে সতীপীঠ ফুল্লরার কথা উল্লেখ আছে। প্রজাপতি দক্ষরাজ কন্যা সতীর অধোরোষ্ঠ এখানে পড়েছিল (স্থানীয় লোকেরা বলে দেবীর ফুল বা গর্ভের প্ল্যাসেন্টা পড়েছিল)। দেবী এখানে ফুল্লরা আর ভৈরবের নাম বিশ্বেশ। বিশ্বেশ পীঠ-চত্বরেই পৃথক ছোটো একটি মন্দিরে অবস্থান করছেন। মূল মন্দিরের ভিতরটা জুড়ে কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ড। পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না। ভালো করে লক্ষ্য করলে মনে হয় পাথরের সামনের ভাগটা ওষ্ঠাকৃতির। রক্তবস্ত্রে আবৃত পাথরটি সিঁদুরে টকটকে লাল। অসংখ্য জবা ও বেলপাতায় আচ্ছাদিত। মন্দিরে দেবীর কোনও বিগ্রহ নেই। পীঠদেবী জয়দুর্গা মন্ত্রে নিত্যসেবা পান। কথিত আছে, অতীতে বহিরাগতদের আক্রমণের ভয়ে নাকি পীঠদেবীর বিমূর্ত প্রস্তরখণ্ড মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। বর্তমান মন্দিরটি নাকি ওখানেই তৈরি হয়েছে। মন্দিরের বাইরে রয়েছে নারায়ণ গিরি প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডির আসন যাতে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া অর্থাৎ আসনটিও টাইল দিয়ে বাঁধানো।

শোনা যায় কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে সাধনরত অবস্থায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কৃষ্ণানন্দ গিরি অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখানে আসেন এবং মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে বলি সহকারে দেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। মাঘী পূর্ণিমায় তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন বলে বছরের ওই দিন থেকে কয়েকদিন এখানে উৎসব হয় এবং দশদিনের এক বিরাট মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। তখন ফুল্লরার আকাশ-বাতাস আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। মন্দিরে দেবীর নিত্যভোগ হয়। তার একটি পদ অবশ্যই মাছের টক। সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে কেউ আমিষ বা নিরামিষ যে কোনও ভোগের প্রসাদ পেতে পারেন। বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানও করা যায় কারণ মন্দির চত্বরের পূর্ব দিকে রয়েছে তেঁতুল বাগান ঘেরা প্রশস্ত জায়গা, দক্ষিণা জমা দিলে মন্দির থেকেই অনুষ্ঠানের জন্য আমিষ ভোগ সরবরাহ করা হয়।

দেবীর অন্নভোগ শিয়ালকে খাওয়ানোর প্রথা ছিল। শিবাভোগ বেদিটি এখনও আছে তবে শিয়ালরা আর আসে না। শনি-মঙ্গলবারে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন। ভক্তেরা কয়েকটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করে থাকেন। যেমন হাড়িকাঠের তলার মাটির প্রলেপ ব্যবহার করলে চর্মরোগ সেরে যায়, এমনকি শ্বেতীও, অথবা বিকলাঙ্গ রোগীরাও নাকি দেবীর কৃপায় রোগ মুক্ত হয়েছেন।

আজ রাতটা লাভপুরেই থেকে গেলাম। বড়ো সুন্দর গ্রাম এই লাভপুর। ছোটো রেলের লাভপুর স্টেশন তো ছবির মতন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান এই লাভপুর। আপন খেয়ালে হেঁটে বেড়াতে বেশ লাগে এখানে।

সকালের বাসে লাভপুর থেকে কঙ্কালীতলা চলে এলাম। পীঠ নির্ণয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—

"কাঞ্চী দেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরু নামকঃ
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা...।"

অর্থাৎ কাঞ্চী দেশে দেবী সতীর কঙ্কাল পড়েছিল, দেবীর নাম দেবগর্ভা, ভৈরবের নাম রুরু। অপরদিকে, অন্নদামঙ্গলে কবি ভারতচন্দ্রও এই পীঠস্থানের বন্দনা করে বলেছেন—

"কাঞ্চী দেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম।"

পীঠ নির্ণয়তন্ত্রের কঙ্কাল আর ভারতচন্দ্রের কাঁকালি কী এক? পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী দেবীদেহ খণ্ড বিখণ্ড হলে কঙ্কাল থাকার কথা নয়, তাই কাঁকাল বা কটিদেশ পড়েছিল— ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এই তথ্য আমাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

গবেষকদের মতে, এই কাঞ্চী দেশ দক্ষিণ ভারতে নয়, এই কাঞ্চীদেশ বোলপুর স্টেশনের দুই ক্রোশ দূরে বেঙ্গুটিয়া গ্রামে। কোপাই নদীর তীরে একটি শ্মশানের ধারে এই পীঠস্থান। জায়গাটি নির্জন ও মনোরম।

কঙ্কালীতলায় আগে কোনও মন্দির ছিল না, ছিল একটি ছোটো কুণ্ড। জনশ্রুতি এই কুণ্ডে দেবীর কাঁকাল পড়েছিল, তাই কুণ্ডের জল মহাপবিত্র। দেবী এখানে দেবগর্ভা এবং ভৈরব রুরু। কুণ্ডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা একটি শিলাকেই দেবীর প্রস্তরীভূত অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়। কুণ্ডের কাছে চারিদিক খোলা একটি বেদি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একশো আটটি নরমুণ্ড প্রোথিত আসন। এই বেদিতেই দেবীর পুজো হত। বর্তমানে বেদির উপর একটি মন্দির তৈরি হয়েছে। বৈঁচিগ্রামের কোনও এক ব্যবসায়ী

এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। মন্দিরের সামনেই বিশাল বিশাল গাছের সমাবেশ। মন্দিরের ভিতরে কোনও বিগ্রহ নেই, আছে শ্মশানকালীর বেশ বড়ো মাপের বাঁধানো ছবি। এই ছবিই নিত্যপূজা পায়। চৈত্র সংক্রান্তির আগে ভক্তরা কুণ্ডটিকে পরিষ্কার করেন এবং শিলাটিকে পরিষ্কার করা হয়। দেবী-অঙ্গ ছাড়াও পঞ্চশিব জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তির সময় তাঁদের জলের উপর তোলা হয় এবং উৎসবের পরে আবার তাঁরা জলের নীচে ফিরে যান। প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে দেবীর উদ্দেশে তিনদিনের এক বিরাট মেলা বসে। তীর্থযাত্রীর সংখ্যা তখন প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার।

দেবী দেবগর্ভার কুণ্ডের দিকে যেতে বাঁদিকে পড়বে একটু উঁচু জায়গা। বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় কাঞ্চীশ্বর শিব এবং ভৈরব রুরু মন্দির। কঙ্কালীতলায় নিত্যভোগ হয় না এবং তীর্থযাত্রীদের থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। বোলপুর থেকে ৮ কিলোমিটার ও শান্তিনিকেতন থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে এই কঙ্কালীতলা। এবারে আর ফিরে শান্তিনিকেতনে না থেকে বাড়ি ফেরার পথ ধরলাম।

শক্তিপদ ভট্টাচার্য

পেশা শিক্ষকতা। ভ্রামণিক। লিখে চলেছেন মূল্যবান অভিজ্ঞতা। পশ্চিমবঙ্গ জেলা ভ্রমণের সাতটি পুস্তকের লেখক। জেলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণায় নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন।

ভ্রমণ তথ্য

সার্থক ভ্রমনকাহিনি রচনা সোজা নয়। তার জন্য চাই পাকা হাত আর সজাগ দৃষ্টি। নতুন দেশে এলে ভ্রমনকারীর মন সজাগ হয়ে ওঠে, দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে পেতে চায় অভিনবকে; জীবনের নব নব আনন্দের জানালা খুলে যায় তার সামনে। সেই আনন্দ যখন নতুনভাবে পরিবেশিত হয়— তখন পাঠক হয়ে ওঠে ভ্রমনকারীর মানসসঙ্গী। কোনও নতুন শহরে বা বন্দরে বা তীর্থে ভ্রমণের পরিচয় নয়, সেখানকার সুস্বাদু ভোজ্য তালিকা, সুলভ বস্তুতালিকাও নয় বা হোটেল বিবরন নয়, ভ্রমনকাহিনি তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু। এই অতিরিক্ত তিনিই দিতে পারেন যার চোখ, কান খোলা, ইন্দ্রিয়গ্রাম থাকে সচেতন। তাই ভ্রমনকাহিনি ভ্রমন ও কাহিনির যোগফল মাত্র নয়, তার চেয়ে স্বতন্ত্র কিছু।

পাতার আড়াল ভেঙে ফুল চোখ মেলে

গৌরী বর্মন

আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে উঠে যে স্বপ্নবোধ

যে মানুষ একবার নিজের ভাষায় নিজের মাকে ডাকে, সেই ডাক আর দেশের মাটি তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভালোবাসা। নিঃশর্ত প্রেম। ভোরের আলো ফুলের গন্ধ/নানান পাখির বুলি/মচর মচর ছড়িয়ে আছে বলে/পথ চলতে পায়ে লাগবে নানারঙের ধুলি।

২০১৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ধানমুণ্ডির বাস টার্মিনাস থেকে শহীদবেদী পর্যন্ত দলে দলে হেঁটে চলেছে সব। অগণিত সেই মানুষের মিছিলে আমরাও হাঁটছি। সেকি উন্মাদনা! কারও গলায়–'বাংলার মাটি, বাংলার জল' কোথাও বা 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'...। সোনারোদে চকচকে সব হাসিভরা মুখ। আবালবৃদ্ধবণিতা আনন্দরসে ডুবে মাতোয়ারা। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'– জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। 'জীবন, ভাষা, সংস্কৃতি'র এক অপূর্ব আবেগমথিত সম্মেলনে যাওয়ার সুযোগে বাংলাদেশে পা রাখা।

২০ ফেব্রুয়ারির দুপুরে তারকাঁটার ওপারে গিয়ে অর্থাৎ আখাউড়া (ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে) সীমানা পার করে ভিজে এঁটেল মাটিতে পা দিয়ে চোখ মেলে দিলাম দূরে। আট-দশটি শালিখের দল কিচ্ কিচ্ করতে করতে কী সুন্দর এডাল-সেডাল ঘুরে আমাদের আগেই চলে এসেছে। নীরবে ঘাস-জমিতে ঘোরফেরা। নেই কোনও শাসন, নেই কোনও বাঁধা। আমরা দু'পেয়ে সেইরকম দশজনের দল ঘাটে ঘাটে নিজেদের 'মান+হুঁশ' প্রমাণিত করে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা দুই ঘণ্টায় পাড়ি দিলাম। নিজেদের সভ্য, সংস্কৃতমান ভাবতে দুঃখ, লজ্জা দুই-ই বোধ হল।

স্পর্শ থেকে কত দূর

স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বাংলাদেশ। সবুজ, শস্য-শ্যামলা, নদীমাতৃক দেশ। ছোটোবেলার স্কুলের বইয়ে পড়া। চোখ মেলে দিলেও মাঝে মাঝে চোখ আটকে যায় হঠাৎ মাথা তোলা কংক্রিটের বা টিনের চক্‌চকে ঢাকনায়।

সীমান্ত পারের পরে দৌড়েমৌড়ে অটো করে আখাউড়া রেলস্টেশন। নিঝুম রাতে হানা দেওয়া আখাউড়া রেলের হুইসেল। জেঠিমা বলতেন–'ভৈরব বাজার যাওনের থাকলে, ভোররাতের এই ট্রেনে চাপা ভালো'। ২০ ফেব্রুয়ারির শেষ দুপুরে সেই রেলস্টেশনের সঙ্গে দেখা। হৈ হৈ-রৈ রৈ! রেল তো চলে এল বলে। বাংলাদেশের প্রথিতযশা কবি মুনিরভাই এলো কি? আমাদের ঢাকা যাওয়ার রেলের টিকিট মুনির আর তাঁর বন্ধুরা নিয়ে আসবেন। দলের অধিপতি নাট্যকার সুভাষ দাস, কবি দিলীপ দাস দুজনে স্টেশনের বেঞ্চে বসে। ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত ভাষাবিদব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাদের আগরতলায় যাত্রা। সীমানা অতিক্রমণের সময়ে মুনির ভাই আমাদের টিকিট দিয়ে গেলেন। যাক, নিশ্চিন্ত, ঢাকা আমরা যাচ্ছি। সবাই যার যার জিনিসপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষায়। সন্ধ্যে পার করে সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসার ঘোষণা। প্ল্যাটফর্ম অদল বদল। যাইহোক, আমরা সবাই অবশেষে ঢাকাগামী ট্রেনে আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট, বাংলা বর্ণমালা জপতে জপতে কামরা খুঁজে নিজেদের আসনে বসলাম। যাত্রা শুরু।

আমি আর পান্না চৌধুরী প্রথম বাংলাদেশ যাচ্ছি। ভয়, ভয়, কী হয় কী হয়! ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা, আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা গেল। রাত হয়ে গেছে, তাই চা-এর কোনও হদিশ পাওয়া গেল না, এই ছোটো আফশোষ; নইলে যাত্রা ভালো।

জানালায় প্রতীক্ষা উৎসুক চোখ। রাত হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় হালকা ফুলকা শান্ত মেয়ে বাংলাদেশ। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, ভৈরববাজার সব দেখতে দেখতে পুরোনো কথাকাহিনি আবছা আবছা মনে করে করে চলা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে, এই শীত শেষের নদী নালা শুকনো, ক্ষয়া, না খেতে পাওয়া শীর্ণকায়া। 'বর্ষার সময়ে অবশ্যই আসবো' এই নীরব প্রতিজ্ঞা নিয়ে ট্রেনে দুলছি, দুলছি।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় ঢাকায় প্রবেশ। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য হাজির হাস্যমুখ স্বেচ্ছাসেবক দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাভার গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের পাঠরত। আমাদের গন্তব্য গণবিশ্ববিদ্যালয়।

দীপশিখা জ্বলে

সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'প্রতিবেশীকে জানুন'– এই শিরোনামে 'জীবন, ভাষা আর সংস্কৃতি' বিনিময় বা পরিচয়-এর ইচ্ছেতে তিনদিন ব্যাপী আলোচনা চক্র।

২০ ফেব্রুয়ারির মাঝ রাত থেকে শুরু হয়ে যায় ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ। ২০ ফেব্রুয়ারি প্রায় রাত শেষে অনেক আমন্ত্রিতের আগমন। তাই সকাল আটটায় ২-য় পর্বে আমাদের নিয়ে গাড়ি ছুটে চলে ঢাকার উদ্দেশে। দলে দলে মানুষ নেচে গেয়ে, চলার পথে আলপনা এঁকে, পলাশ-শিমুলের ঝরা পাপড়ির আদর খেতে খেতে, বাংলা

বর্ণমালায় সেজে ছুটে চলেছে শহীদ মিনারের দিকে। আমরাও চলছি এক অনাবিল আনন্দধারার স্রোতে সামিল হয়ে। আমার সহযাত্রী ভায়ের মুখ/আমার সহযাত্রী জননীর স্বর/ফুল হোক, আলো হোক/অমল রৌদ্রের মতো/বিচ্ছুরিত হোক এই পূর্বদেশে। (কবি অনিল সরকার)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া মেয়েরা বলছিল– 'আপা আমরা সারা বছর ধরে ভাবি, ভাষাদিবসের সাতদিন আমরা কীভাবে সাজবো, কোন রঙে মাতবো। স্বপ্না কুণ্ডু, আফ্রিকা সিদ্দিকি– দুই বোন, দুই সখী। মনে মনে প্রার্থনা। আশার আলো– এই ভাষা জাত ভুলিয়ে, ধর্ম সরিয়ে এক পথে হাঁটবে। সংগ্রামে, শপথে এককাট্টা হবে।

ঢাকা শহীদ স্মারক বেদী, শাহবাগ সমাধি চত্বর ফুলে ফুলে ঢাকা, সবাই বলছে তুমি আছো, আমাদের মনে মননে, ভালোবাসার আগুনে। জনতার এমনগতি যে মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকা যায় না– চরৈবতি চরৈবতি হয়ে চলতে থাকা। দেখতে থাকা আর আবেগ ছুঁয়ে দেখার এক অপরিসীম আনন্দ অবগাহন।

আনন্দিত, উৎফুল্ল মন অথচ ক্লান্ত পায়েদের ক্ষণিক বিরাম দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উষ্ণ আতিথেয়তা। বুভুক্ষু উদর শান্ত হল এক অভাবনীয় মধ্যাহ্নভোজে। মাঝখানে ভাবের আদানপ্রদান হল সোৎসাহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমির বইমেলা প্রাঙ্গন সব ঘুরে, সন্ধ্যে গড়ালে সাভারের পথে ফেরা। লাল পলাশ বিছানো পথে বিকালের সোনারোদ হাসছে। চৌরাস্তার মাঝে মঞ্চে গান, যেন সমুদ্র ঢেউ– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। 'আমরা হিন্দু ও মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।... প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় এবং ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক, টুপি-লুঙ্গি-শাড়িতে তা ঢাকার জো নাই।' (শহীদুল্লাহ) ক্লান্ত, কিন্তু লাখো মানুষের মাতৃভাষার জন্যে ভালোবাসার উন্মাদনা, ভালোবাসা, আবেগ বলছিল– 'আমায় ক্ষমো হে, ক্ষমো'। মানুষের আবেগ বাঁধনহারা। বাস গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে কর্মীদের সহাস্য মুখ আতিথেয়তার ছোঁয়া বলে– 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু'।

বাড়ির পাশে আরশিনগর

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া, শালিখ-তিতিরদের খেলা, গান, নাচানাচি চোখ জুড়ানো হিমছোঁয়া সবুজ প্রান্তর। ওরা মাঠে কাজ করে, অতিথিদের হাসিমুখে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। নির্মল সুন্দর পরিবেশ। 'কর্মই জীবন'– এই আপ্তবাক্যের সার্থকতা দানের জন্যে সদা সচেষ্ট শিক্ষার্থীরা গণ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আমের মুকুলে ভরা ডাল হাওয়ায় মৃদু দোলায় হাসছে। হাওয়া ফুলেরা বলে– বসন্ত এসেছে দ্বারে। 'উঠো', 'জাগো' চারদিকের ব্যর্থ আবর্জনা সরিয়ে নতুন করে কিছু ভাবো, করো।

মায়ের ভাষার জন্যে সবটুকু ভালোবাসা, সব আয়োজন। পড়োশীদেশের রাজ্য পশ্চিমবাংলা, উড়িশ্যার উত্তর-পূর্বের সাতবোন হাজির। একে অন্যকে জানার বোঝার আশায়। সকালে নির্মল হাসি নিয়ে উপস্থিত– জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফরজানা ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও অনেক শুভানুধ্যায়ী। ত্রিপুরা ছোটো রাজ্য। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম এবং প্রধান আন্তরিক বন্ধু। মুহুর্মুহু প্রতিটি জন ত্রিপুরার প্রতিনিধিদের ভালোবাসার পুণ্যজলে অভিনন্দিত করছিলেন।

মাতৃভাষা এবং তার অবস্থানে শুধুমাত্র বাংলাভাষা নয়। অরুণাচল, মেঘালয়বাসীরাও আক্রান্ত। শিল্প সংস্কৃতি এই আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত। আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের সঙ্গে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের নিজের মতো চলা, নিজের হাতে কাজ করা– স্বনির্ভরতার বার্তা বহন করছিল। উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্য কথায় এবং কাজে অনুভব করছিল আত্মীয়তার উষ্ণতা। মণিপুর, মেঘালয়ের অতিথিদের ভাষা কোনও বাধা নয়, বরং মাতৃভাষার জন্যে নিজেদের শিল্প সংস্কৃতি বিপন্নতা বোধে তরুণ প্রজন্ম চিন্তিত। নিজেদের মনের ভাব এই প্রতিবেশী বন্ধুদের বোঝাতে পেরে ওরা আনন্দিত।

ইট-কংক্রিট-সিমেন্ট ভরা লোকালয় থেকে বহুদূরে আম-জাম, শাল-সেগুনের গাছের ভিড়ে আবছা অন্ধকার নামে। সন্ধ্যা পেরোয়। খোল, করতাল, দোতারা, বাঁশি নিয়ে সুর ভাজে– 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'। জাত, ধর্ম, কিছু নয়; সবার উপরে মানুষ সত্য। লালন সংস্কৃতি লালন করছে এই ভাবধারা আর দর্শন। ঘণ্টা তিনেকের সুর-মূর্চ্ছনা দর্শক, শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে রাখে।

আজো ঝরে অনিবার ভালোবাসা আর ভালোবাসা

স্বেচ্ছাসেবকদের 'সুপ্রভাত', মিষ্টি হাসির সম্ভাষণে রাতের জড়তা নিমেষে উধাও। প্রাতরাশের থালায় হাতে করা রুটি, খোলা পিঠা সঙ্গে খেজুরের লালি। মুড়ি, নারকেল– বড়ো শহর তো দূর ছোটো শহরের অধিবাসী আমরা এসবের স্বাদ সচারচর পাই না। সহজ, সরল, খাদ্য পরিবেশনের সঙ্গে দ্বিগুণ ভালোবাসা যোগ হয়ে উদরপূর্তি।

শিক্ষা এবং মাতৃভাষা– মায়ের ভাষা, মুখের বুলি মাতৃদুগ্ধসম– শিক্ষার সহজীকরণ অথবা শিক্ষায় সর্বজনীনতার সুর জাগিয়ে তোলার মাধ্যম মাতৃভাষা। ২৩ ফেব্রুয়ারির আলোচনা চক্র ও অতিথি আপ্যায়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রাতরাশ শেষে গণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাহাঙ্গীর নগর যাওয়ার পথে দেখা হল শহীদ স্মারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের দীঘি ভরে হাসছে জলপদ্ম। রাস্তা জুড়ে পলাশের লাল নিশান।

রাত্তিরে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আতিথ্য গ্রহণ ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সান্নিধ্য সঙ্গ সুখ নিয়ে পুনরায় গণবিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসা। উপাচার্য মহোদয়া বারবার বিনীতভাবে প্রতিবেশীকে জানা বোঝার প্রক্রিয়াকে গতিদান করেন ও সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান।

সেই ঘন ঢেউ তোলা অরণ্যে

টস টস করে পড়ছে মুক্তোর মতো জলধারা

ঠাণ্ডা হাওয়া আর শালিখের পাখা ঝটপটানি বলে– সকাল হল।

এরপর ৫২ পাতায়

নেহাৎ দৈববশে

বিপ্লব বসু

দারুণ, অসাধারণ, ফাটাফাটি ইত্যকার বিশেষণগুলি শোনা ছিল। পাচমাড়ি মধ্যপ্রদেশের একমাত্র শৈলশহর। ধূপগড় পাচমাড়ির অবশ্য দ্রষ্টব্য ভিউপয়েন্ট। প্রচুর পর্যটক এখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উপভোগ করে থাকেন। ঘুরে যাওয়া চেনা পরিচিতদের এখানকার প্রশংসায় পঞ্চাননমুখ হতে দেখেছি।

বললাম বটে 'সূর্যোদয়', কিন্তু সুযোগটা বড্ড কম। মূল শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে ধূপগড়। সাতপুরা পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় এটি। থাকার আস্তানা বলতে একটি প্রাচীন পি ডব্লু ডি বাংলো। সূর্যোদয় দেখতে হলে এখানে রাত্রে এসে থাকতেই হবে। বিশেষ কেউ এসে থাকেন বলে মনে হল না।

থাকার জন্য জায়গাটি কিন্তু চমৎকার। গাড়ি থেকে নেমে খানিক হেঁটে এলেই বাংলোটি। নির্জন তো বটেই, গাছগাছালিতে ভরা। সামনেই একটা বিরাট 'রকফেস', এবড়োখেবড়ো দেওয়াল। একেক দিকে দেখলে একেকরকম মুখচ্ছবি বা মুখভঙ্গিমা ভেসে ওঠে। চাঁদনি কিংবা নক্ষত্রখচিত রাত নিশ্চয়ই এখানে অন্য মাত্রা পায়। বাংলোর বাঁদিকে সূর্যোদয় দেখার পয়েন্ট। খাড়া অতলস্পর্শী খাদের ঠিক উপরে রেলিংঘেরা জায়গাটি। দিনের যে কোনও সময়ে এখানে দাঁড়ানো যাক না কেন, চেতনায় একটা ঝাঁকি লাগবেই। থাকার জন্য বিলক্ষণ লোভনীয় স্থান, সূর্যোদয় তো সুগ্রীব দোসর।

কিন্তু আমার কপালে 'সূর্যোদয়' নেই। সূর্যোদয়ের জন্য খ্যাতি আছে এমন বেশ কয়েকটি পর্যটন ক্ষেত্র ঘোরা আছে। ঘটনাচক্রে ঘটনাটি আমার সাক্ষাতে কখনই ঘটেনি। বলতে চাইছি পূর্ণাঙ্গ রূপে ধরা পড়েনি। মেঘ বা কুয়াশার চক্রান্তে বঞ্চিতই থেকে গিয়েছি। এ বৈরিতা আমি মেনে নিয়েছি। তবে হ্যাঁ, সূর্যাস্তের সঙ্গে সম্যক পরিচয়টা আছে। সুযোগ পেলেই সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করি। সেই কারণেই ধূপগড়ে আসা।

সব খাবো, সব কিনবো, সব দেখবো ইত্যাদি 'সব'-ইসম-এ আমাদের বিশ্বাস নেই। পাচমাড়িতে পা দিলেই ট্যুর অপারেটর, জিপওয়ালারা একটা তিন দিনের ঠাসা সফরসূচি ধরিয়ে দেয়। আমাদের হাতেও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খরচ করে গিয়েছি, আবার আসা হবে কিনা ঠিক নেই। কিন্তু দেড়েমুশে সবকটি দ্রষ্টব্য দেখার দিব্যিও নেই। কাটছাঁট করে দেড় দিনের একটা হালকা সূচি তৈরি করেনিলাম; ধীরে সুস্থে কয়েকটা দেখবো, তৃপ্ত হবো।

ছোটা মহাদেব, বড়া মহাদেব, জটাশঙ্কর, পাণ্ডবগুহা, অপ্সরা বিহার, বি-ফলস, রজতপ্রপাত ইত্যাদি ছিল আমাদের তালিকায়। সবশেষে ছিল ধূপগড়। ধূপগড়ের সূর্যাস্ত। ট্যুর অপারেটরদের প্রোগ্রামেও দিনের শেষে থাকে ধূপগড়। যেহেতু আমাদের দেখার বিষয় ছিল কম, অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছি অন্তিম আইটেমে। চাদ্দিক আয়েশ করে ঘুরে দেখে এসে বসলাম 'সানসেট পয়েন্ট'-এ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাঁধানো গ্যালারি। দেখেই মালুম হল সিজনে ভিড় কেমন হয়।

ক্রমশ লোকজন আসতে শুরু করেছে। অফ সিজনেও ভিড় ভালোই। ভক্ত পরিবৃত হয়ে একজন মুসলিম ধর্মগুরু এলেন। সমীহ আদায় করা সম্ভ্রান্ত চেহারার গুরু, এসে বসে পড়লেন গ্যালারিতে। কচিকাঁচা, একটু বড়ো, মাঝবয়সীরা সংখ্যায় বেশি। পৃথুলা, স্ক্রাচ সহ, বয়সভারে নুব্জ মানুষজনও আসছেন। টুকটাক খাওয়া, গল্পগুজব, হেসে গড়িয়ে পড়া, সেলফি তোলা নিয়ে সময় গড়াচ্ছিল। খানিক পরে ভক্ত সহ এক হিন্দু ধর্মগুরুর আবির্ভাব। চেহারা এবং পোষাকাষাকের পরিপাট্য দেখার মতো। পাশ দিয়ে স্নিগ্ধ সুগন্ধ ছড়িয়ে চলে গেলেন। সূর্যাস্ত দেখতে এসে অনেক কিছু দেখে ফেললাম।

এবার সূর্যদেবের গড়ান শুরু হয়ে গেছে। অস্তরাগের রং মাখা শুরু হতেই সবাই মনযোগী। হাতে হাতে ক্যামেরা রেডি। আমার সঙ্গীদের আক্ষেপ, আকাশে একটুও ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতলা স্তরের মেঘ নেই। থাকলে সূর্যাস্তের ছবি জমে যায়। অবশ্য ক্যামেরা, মোবাইলের ক্লিক-ক্লিকের বিরাম নেই। সূর্যের চেহারা এখন মোলায়েম, সরাসরি তাকানো যায়। গভীর কমলা রং, নিখুঁত গোল। খানিক বাদেই সামনের পাহাড়টার আড়ালে টুপ করে অন্তর্ধান করার কথা। কিন্তু কথাতো সবসময় থাকে না। মুগ্ধতা শুরুর আবেশে, নীচদিকের চওড়া মেঘপট্টিটা খেয়াল করিনি। রসভঙ্গ হতে বিরক্তি নয় হতাশা বয়ে গেল। বিচ্ছিরিভাবে মেঘের কবলে দিনমনি গ্রাস হতে থাকলেন। অনিবার্য পরিনতি টের পেয়ে ভিড় ভাঙতে সময় লাগে না।

পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই সূর্যের উদয় এবং অস্ত সদা মনোমুগ্ধকর। অবস্থানগত স্থানমাহাত্ম্যে আরও আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। প্রত্যেকদিন পৃথিবীর বিভিন্ন কোণায় এই প্রাকৃতিক ঘটনাদুটির ছবি ওঠার মোট সংখ্যার আন্দাজ করতে গেলে ভিমরি খেতে হবে।

পরদিন পাচমাড়ি ছাড়ব খুব ভোরে। সকাল সাড়ে পাঁচটার বাসে পিপারিয়া যাব। পিপারিয়া থেকে ট্রেন যোগে জব্বলপুর। ওখান থেকে রাত্রে বাড়ি ফেরার ট্রেন।

অন্ধকার থাকতে বাস ছেড়েছে। জানলার কাচ বন্ধ। কাচে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমের কাটতি মেটাতে শুরু করে দিয়েছি। মাঝে মাঝে লোক ওঠানামা করছে। টের পাচ্ছি, আবার ডুবে যাচ্ছি। বাইরে একটু একটু আলো চোঁয়াচ্ছে। কিন্তু চোখের শাটার সেসব তোয়াক্কা করছে না। চটকা ভাঙল কাঁধে একটা ধাক্কায়। টের পেলাম 'কর্মকারক' পিছনের সিটে বসা সঙ্গী। বিরক্তি সহ পিছন ফিরতে, নিঃশব্দে জানলার দিকে ইশারা করে। জানলার বাইরে বিশাল প্রাকৃতিক পর্দায় গতকালের ধূপগড়ের 'রিভার্স প্রজেকশন' শুরু হয়েছে। এখানেও শুরুতে একটা চওড়া মেঘপট্টি। সেটা ডিঙিয়ে দিবাকর প্রকট হচ্ছেন। কাল ছিল নিভন্ত আঁচ, এখন উল্টো। সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে নিরাভরণ আকাশে আপাত ভাসমান, রক্তবর্ণ, কমলা রং ধারনে এখনও কিছু মুহূর্ত বাকি। এইসময় কোনও ছেঁড়া, পাতলা মেঘ থাকলে বোধহয় রাজকীয়তায় টোল পড়ত। অধীশ্বর হওয়ার যাবতীয় ইঙ্গিত আত্মপ্রকাশের দিকে চোখ ফেরায় কার সাধ্য। ইতিমধ্যে ধীরে, খুব ধীরে আদিগন্ত সবুজ শস্য খেত দৃশ্যমান হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে সূর্যোদয়! শুনেছি বলে মনে পড়ে না। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপ্রেরণা কি এই ব্যঞ্জনায়!

হলুদ রং ধরলো বলে; যতক্ষণ তাকানো যায় তাকিয়ে থাকতেই হবে।

বিপ্লব বসু
চাকুরিজীবী, নেশা– ভ্রমণ
আর পত্র-পত্রিকায় বৈচিত্রময় লেখা।

পাতার আড়াল ভেঙে ফুল চোখ মেলে

৫০ পাতার পর

ওঠো। 'পাখির ডাকে জাগে'। কানে বাজে 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে'। বাংলাদেশে প্রথম আসার অভিজ্ঞতা আর ভাষাদিবস স্মরণে 'জীবন, ভাষা, সংস্কৃতি' জানাবোঝার বিশাল আয়োজনের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত বা সৌভাগ্যবান ভাবতে সংকোচ বোধ হচ্ছে না।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন গৃহ প্রবেশপথে বেশ কিছু পোস্টার কাঠের ফ্রেমে সযত্নে ধরা আছে। মহিলা সশক্তিকরণের কাজে গণ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু উৎসাহী নয়, মহিলাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের নির্ভরতার এক মহান দায়িত্বও তারা পালন করে। অর্ধেক আকাশের পূর্ণ অধিকারী গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরতা মেয়েরা। আবাসনের চারদিকে খোলা মাঠ। মাঠের মাঝে মাঝে মাটি আর কাঠের ঘর-বাড়ি। আবাসিকদের থাকার বন্দোবস্ত। আশেপাশে সবজি বাগান, ধানক্ষেত। পুকুর আছে, তবে জলাশয় বলা ভালো। আকার বিরাটত্বের দাবীদার। শিক্ষার্থী মেয়েটি জানায় আবসিকদের নিয়মিতভাবে বাগানের এবং হাসপাতালে শ্রমদান বাধ্যতামূলক। ছায়া ছায়া পথে গণ হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়, ছাপাখানা, কাঠের কারখানা, কাপড়ের কাজের ঘর, খাবার তৈরির কারখানা সব দেখা হল। আশ্চর্য করে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মনোভাব। 'স্বচ্ছ অভিযানে'র জন্য গলা ফাটানো নয় বরং কর্মীরা বলছে– স্বচ্ছতা হল দৈনন্দিন সুস্থ জীবন রক্ষার অঙ্গ। অভিযানের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভাষা দিবসকে স্মরণ করে বা উপলক্ষে আলোচনা চক্র আর সেখানে বাংলাভাষার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা অবশ্যই থাকবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি পুরোদিন ব্যাপী তাই হল। আজকের দুনিয়া হাতের মুঠোয় থাকতে হয়। নইলে পিছিয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী। ডিজিটাল বাংলা সাহিত্যের আলোচনার পাশাপাশি লিটল ম্যাগাজিন, শব্দসৃষ্টির ভাষা সব আলোচনায় উঠে এসেছে। আর ত্রিপুরা যেহেতু বাংলাদেশবাসীর কাছে একটি প্রিয়ভূমি তাই ত্রিপুরার সাহিত্য, জনজাতিদের সাহিত্য– এক বিশেষ মর্যাদায় সেখানে উপস্থিত। সবচাইতে ভালোলাগার বিষয় হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উৎসুক এবং জানার জন্যে উদগ্রীব যা অতিথি বক্তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে উৎফুল্লতা দান করেছে। পরস্পরকে জানা বোঝার ইচ্ছার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এবং আগামীদিনে তা শতপুষ্পে বিচ্ছুরিত হবে প্রত্যেকের মনে, এই আশায় সবাই উদ্দীপিত তা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়।

ভাষাদিবসকে কেন্দ্র করে এক অনন্য চৈতন্যের তারাবাতি জ্বেলে দেওয়া হল তিনদিনের সমাবেশের মাধ্যমে। ঢাকা শহরের ঘর্মাক্ত যানজট এবং আরও কিছু ছুটছাট সুবিধে-অসুবিধে সব কিছু ম্লান আয়োজকদের উষ্ণ আবেগ আর পাগলপারা ভালোবাসায়। 'অতিথি দেব ভব'– সার্থক হবে জীবন, ভাষা আর সংস্কৃতি সম্মেলন যখন পড়োশী দেশ, দেশবাসী একসঙ্গে হাঁটবে আর একসঙ্গে জাত-ধর্ম পিছনে ফেলে একে অপরের মনের সাথী হওয়ার ইচ্ছেতে ডানা মেলে দেবে। 'মাটির ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে/জীবন ইশারা জানায় নিসর্গে।/পাতার আড়াল ভেঙে ফুল চোখ মেলে/সূর্যের আলোর দিকে প্রাণের ঘোষণা।

গৌরী বর্মন
শিক্ষিকা, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা
ছোটো গল্পকার, ভ্রমণে বিশেষ আগ্রহী

ছবিতে
বোলান

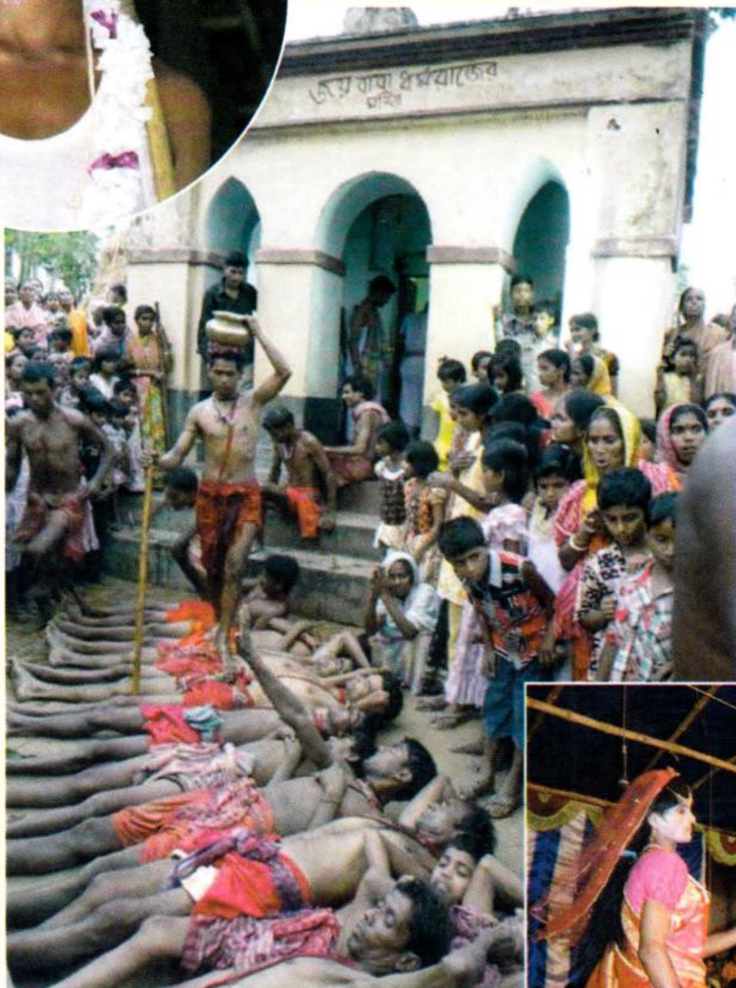

ছবি- সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

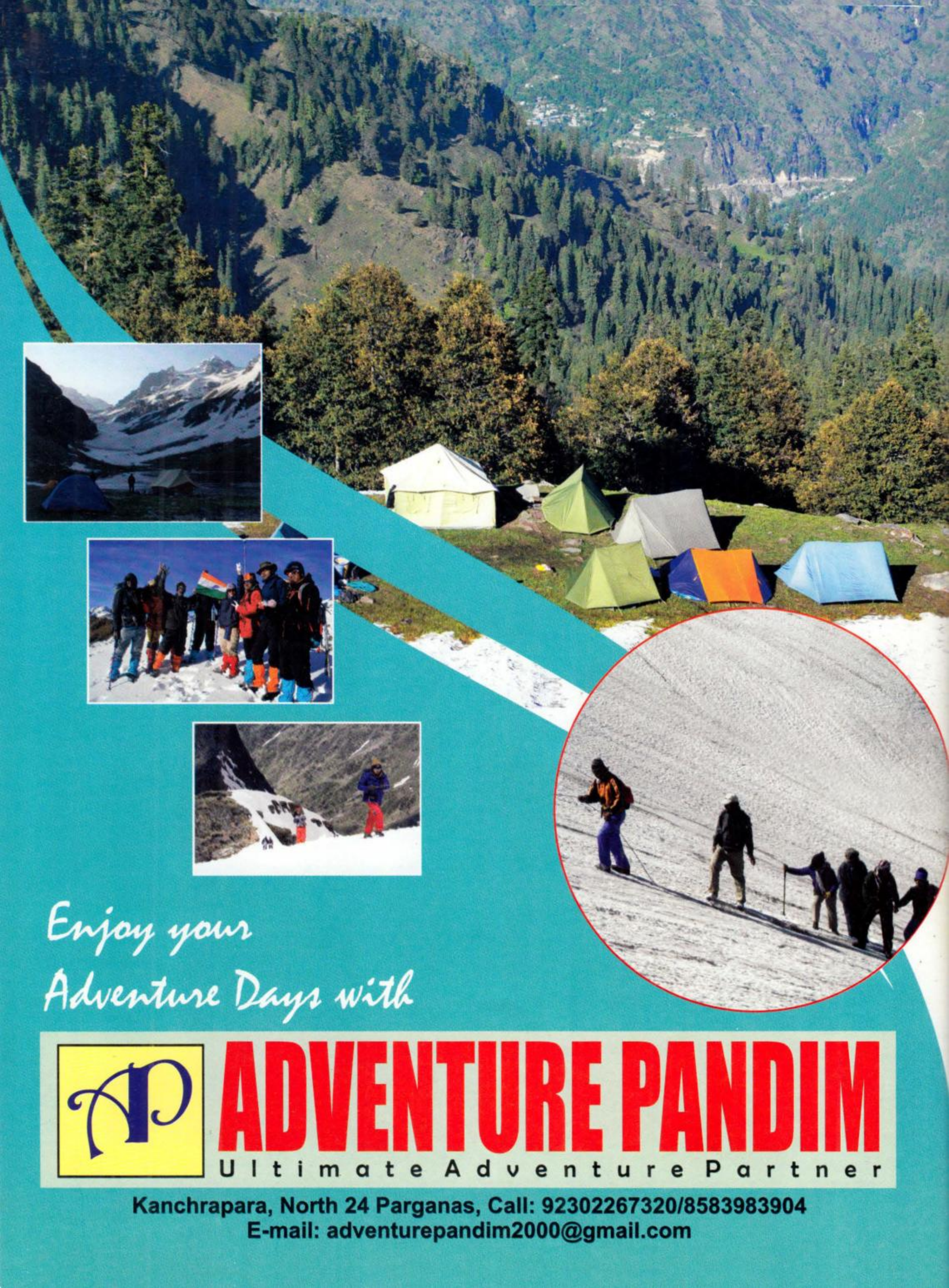
Enjoy your
Adventure Days with
AP
ADVENTURE PANDIM
Ultimate Adventure Partner
Kanchrapara, North 24 Parganas, Call: 92302267320/8583983904
E-mail: adventurepandim2000@gmail.com